পলাশী ট্র্যাজেডির ইতিবৃত্ত

মোঃ জেহাদ উদ্দিন

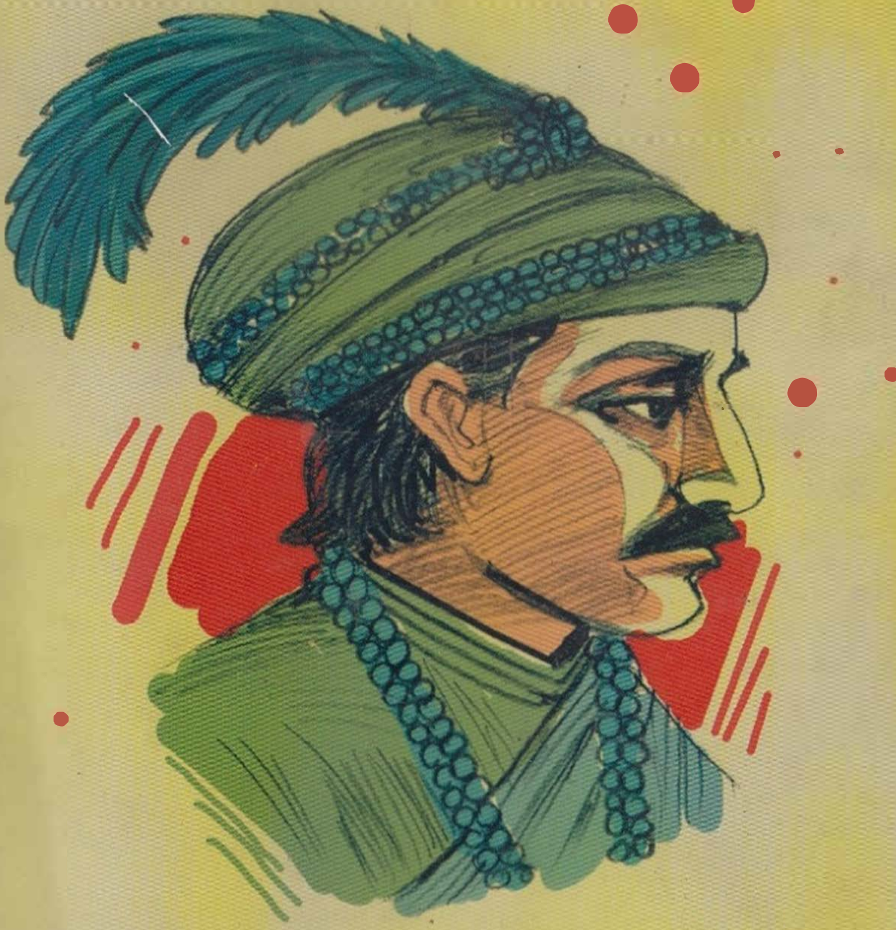

মোঃ জেহাদ উদ্দিন। পেশা: চাকরি, নেশা: পড়াশোনা ও লেখালেখি। জন্ম: ১৯৭৭ সালের ১ জানুয়ারি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলার বেড়তলা গ্রামে। আলহাজ্ব মো. আনোয়ার হোসেন এবং জাহেদা খাতুনের দ্বিতীয় সন্তান।

ছাত্রজীবনে তুখোড় মেধার স্বাক্ষর রাখেন। ৫ম ও অষ্টম শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষায় শীর্ষস্থানীয় ফল। ১৯৯১ সালে এসএসসি পরীক্ষায় কুমিল্লা বোর্ডে সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান এবং ১৯৯৩ সালে ঢাকা বোর্ডে সম্মিলিত মেধা তালিকায় দশম স্থান অধিকার করেন। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি (অনার্স) ও এলএলএম (প্রথম শ্রেণী) ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ২০০০ সালে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল থেকে এডভোকেট হিসেবে সনদপ্রাপ্ত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের পরীক্ষক। খণ্ডকালীন শিক্ষকতা করছেন ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া প্যাসিফিক, নর্দার্ন বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ, ইউনিভার্সিটি অফ ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভসহ বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ একাডেমিতে।

[অপর ফ্ল্যাপে দ্রষ্টব্য]

www.nagorikpathagar.org

ছাত্রজীবন থেকেই সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সদর্প পদচারণা। ছাত্রাবস্থায়ই তিনি সম্পাদনা করেন মাসিক সড়ক পরিবহন পরিক্রমা নামে একটি পত্রিকা। বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় স্বনামে ছদ্মনামে অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন; প্রকাশিত হয়েছে একাধিক গ্রন্থও। ছাত্রজীবন থেকে শিক্ষা সাহিত্য-সংস্কৃতি অঙ্গনে সাফল্যের জন্য অনেক পুরস্কার প্রাপ্তির পাশাপাশি ১৯৯১ সালে প্রধানমন্ত্রী এবং ১৯৯৩ সালে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পুরস্কৃত হন। ২০০৬ সালে বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার কর্তৃক মেধা পুরস্কার পান। একই বছর ভারতের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট এ.পি.জে আবদুল কালাম কর্তৃক সে দেশের রাষ্ট্রপতি ভবনে সংবর্ধিত হন।

ভ্রমণ করেছেন ভারত, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত প্রভৃতি দেশ। তিনি বাংলা একাডেমীর একজন সদস্য। দেশের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেন্ট যোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

প্রচ্ছদ :: খলিল রহমান

www.nagorikpathagar.org

পলাশী ট্র্যাজেডির ইতিবৃত্ত

মোঃ জেহাদ উদ্দিন

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

পলাশী ট্র্যাজেডির ইতিবৃত্ত

মোঃ জেহাদ উদ্দিন

বাঙলাকথা
স্যুট # ১০০৮/এ, নাহারপ্লাজা, হাতিরপুল, ঢাকা-১২০৫

www.nagorikpathagar.org

ব ই ঘ র

পলাশী ট্র্যাজেডির ইতিবৃত্ত
মোঃ জেহাদ উদ্দিন

প্রকাশক
বাঙলাকথা'র পক্ষে
রাবেয়া সুলতানা পারু

© সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ
একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৪

প্রচ্ছদ
খলিল রহমান

কম্পোজ
ব ই ঘ র বর্ণসাজ
বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
০১৭১১৭১১৪০৯

মুদ্রণ : মাসুম আর্ট প্রেস
২৬/২ প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ২৮০ টাকা মাত্র

ISBN : 984-70168-0067-2

PALASSEY TRAGEDY'R ITIBRITYO by Md. Jehad Uddin
Published by : Rabeya Sultana Paru, **Banglakotha** : Suit # 1008/A, NaharPlaza, Hatirpull, Dhaka-1100 **First Edition :** Ekushey Gronthomela 2014
© by the pablisher

Price : 280 Taka only

www.nagorikpathagar.org

একমাত্র পরিবেশক

বইঘর

[অভিজাত বইয়ের ঠিকানা]

৪৩ ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

দূরালাপনী : ০১৭১১৭১১৪০৯, ০১৭২১১২২৫৬৪

www.nagorikpathagar.org

০ ০ ০

কাণ্ডারী! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর,
বাঙালীর খুনে লাল হ'ল যেথা ক্লাইবের খঞ্জর!
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায়, ভারতের দিবাকর!
উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়ে পুনর্বার ॥

কাণ্ডারী হুঁশিয়ার : কাজী নজরুল ইসলাম

www.nagorikpathagar.org

অ র্প ণ

বিশ্বের সকল মুক্তিপাগল মানুষের
করকমলে

এবং

আত্মজ শারাফী ও আসযাদসহ

সকল শিশু-কিশোরকে

যারা ইতিহাস থেকে পাঠ নিয়ে
জাতি গঠনে এগিয়ে আসবে।

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

সময়ের শ্রেষ্ঠ কবি
আল মাহমুদের
অভিমত

ইতিহাসের শেকড়-সন্ধানী লেখক মো. জেহাদ উদ্দিন-এর 'পলাশী ট্র্যাজেডির ইতিবৃত্ত' বইটি আমাকে আলোড়িত করেছে। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের অপরিহার্য অংশ পলাশীর যুদ্ধ। পলাশী বিপর্যয়ের মাধ্যমে বাংলা তথা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়ে যায়। স্বজাতি, স্বদেশের বিরুদ্ধে কুচক্রী মহলের চক্রান্তের ফলে পলাশীর প্রান্তরে সিরাজ-বাহিনী যুদ্ধ না করেই পরাস্ত হতে হয়েছিল; আর এর ফলে ১৯০ বছরের জন্যে অস্তমিত হয়ে যায় স্বাধীনতা-সূর্য।

পলাশী ট্র্যাজেডি থেকে আমাদের শিক্ষা নিয়ে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করতে হবে। তবেই লেখকের এই লেখা সার্থক হবে বলে আমি মনে করি।

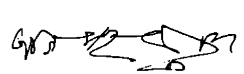

(আল মাহমুদ)

০৮/০২/১৪

www.nagorikpathagar.org

হায় পলাশী!
এঁকে দিলি তুই জননীর বুকে কলঙ্ক-কালিমা রাশি,
হায় পলাশী!
আত্মঘাতি স্বজাতি মাখিয়া রুধির কুম্‌কুম্‌
তোরই প্রান্তরে ফুটে ঝ'রে গেল পলাশ কুসুম।
তোরই গঙ্গার তীরে পলাশ-সকাশ
সূর্য্য ওঠে যেন দিগন্ত উদ্ভাসি ॥

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের সিরাজউদ্দৌলা নাটকের জন্যে লেখা
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর গান

www.nagorikpathagar.org

ভূমিকা

পলাশী প্রকৃত অর্থে কোন যুদ্ধ ছিল না। এটি ছিল চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের ভয়াবহ এক প্রহসন। ভারতের ইতিহাসের বাঁক ঘুরে যায় ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা তথা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সূর্য অস্তমিত হয় পলাশীর প্রান্তরে। ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ এ অধ্যায় সম্পর্কে যথাযথ আলোচনা হওয়া আবশ্যক। এ বিষয়ে আমার ক্ষুদ্র প্রয়াস 'পলাশী ট্র্যাজেডির ইতিবৃত্ত'। বইটি রচনার ক্ষেত্রে আমি যে সকল লেখকের বই-পুস্তক থেকে সাহায্য-সহযোগিতা নিয়েছি তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বইটি প্রকাশের দায়িত্বভার গ্রহণ করায় বাঙলাকথা পাবলিকেশন্স-এর স্বত্বাধিকারী ও মাসিক বাঙলাকথা সম্পাদক রাবেয়া সুলতানা পারুকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাই।

মোঃ জেহাদ উদ্দিন

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশকের নিবেদন

মোঃ জেহাদ উদ্দিনের গবেষণালব্ধ গ্রন্থ 'পলাশী ট্র্যাজেডির ইতিবৃত্ত' প্রকাশ করতে পেরে ইতিহাসের দায় খানিকটা হলেও মেটানোর আনন্দ অনুভব করছি। বইটি পাঠকগণকে ইতিহাসের শেকড়ের সন্ধান দেবে।

আমি বইটির বহুল প্রচার কামনা করছি।

রাবেয়া সুলতানা পারু
সম্পাদক
মাসিক বাঙলাকথা

www.nagorikpathagar.org

সূ চি প ত্র

পলাশী ট্র্যাজেডির ইতিবৃত্ত / ১৭

পলাশী যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও ইতিহাস / ১৯
পলাশী যুদ্ধ / ৩৫
সিরাজের বন্দী ও শাহাদাতবরণ / ৪৪
সিরাজউদ্দৌলার দাফন / ৪৭
সিরাজদ্দৌলার মূল্যায়ন / ৪৯
সাংবাদিক আব্দুল হাই শিকদার-এর সরেজমিন প্রতিবেদন / ৫১
পলাশী যুদ্ধ : চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র আর ট্র্যাজেডির কালো ইতিহাস / ৫৪
সিরাজের ইতিহাসে জগৎশেঠের ভূমিকা / ৬০
সিরাজ-উদ-দৌলার বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ / ৬৩
অন্ধকূপ হত্যার নেপথ্য ইতিহাস / ৬৫
হলওয়েলের হিসাব / ৬৭
সিরাজউদ্দৌলা কি আসলেই নিষ্ঠুর ছিলেন / ৭১
সিরাজউদ্দৌলার ঐতিহাসিক নিমজ্জন / ৭২
সিরাজের চরিত্র হননকারী কারা / ৭৫

পলাশী যুদ্ধের ফলাফল / ৭৯

রাজনৈতিক : ভারতের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হলো / ৭৯
অর্থনৈতিক / ৮০
বাংলা থেকে সম্পদ নিঃসরণ / ৮৬
পলাশী লুণ্ঠন / ৮৬
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর : পলাশী ট্র্যাজেডির কাল অধ্যায় / ৯১
মুসলমানদের অপূরণীয় ক্ষতি / ৯২

পলাশী ষড়যন্ত্রকারীদের পরিণাম / ৯৯

মীরণ / ১০০
মোহাম্মদী বেগ / ১০১
মীর জাফর আলী খান / ১০১

www.nagorikpathagar.org

জগৎশেঠ ও স্বরূপ চাঁদ / ১০৩
রবার্ট ক্লাইভ / ১০৫
রায় দুর্লভ / ১০৬
ইয়ার লতিফ খান / ১০৭
উমিচাঁদ / ১০৭
নন্দকুমার রায় / ১০৮
রাজা রাজবল্লভ / ১০৯
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় / ১১০
নবাব মীর কাসিম / ১১১
স্ক্রাফটন / ১১৩
ওয়াটস / ১১৩
কৃষ্ণবল্লভ / ১১৪
ঘসেটি বেগম / ১১৪

মীর জাফরের কৈফিয়ত / ১১৫
এক নজরে সিরাজউদ্দৌলার শাসনামলের ঘটনাসমূহ / ১৩৩
সংশ্লিষ্ট কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, স্থান, ব্যক্তি / ১৩৬
ফোর্ট উইলিয়ামের প্রেসিডেন্ট ও গভর্নরদের নামের তালিকা / ১৩৮

বাংলা সাহিত্যে পলাশী / ১৩৯
পলাশী বিষয়ক নাটক / ১৪১
উপসংহার / ১৪৮

পলাশী ট্র্যাজেডির কয়েকটি দুর্লভ চিত্র / ১৪৯

www.nagorikpathagar.org

'Whatever may have been his faults, Siraj'd-daulah had **neither betrayed his master nor sold his country**. Nay more, no unbiased Englishman, sitting in judgement on the events which passed in the interval between the 9th February and the 23rd June, can deny that the name of Siraj'd-daulah stands higher in the scale or honor than does the name of Clive. He was the only one of the principal actors in that tragic drama who did not attempt to deceive!'

Cal. Malleson

www.nagorikpathagar.org

লেখকের অন্যান্য বই

- ০ নজরুল : সাম্যে প্রেমে দ্রোহে (বইঘর)
- ০ ইতিহাসের গল্প-১ : ভারত শাসন করলো যারা (বইঘর)
- ০ ইতিহাসের গল্প-২ : ভারতের মুসলিম শাসকদের অজানা কথা (বইঘর)
- ০ বাংলাদেশের আয়কর আইন (বাংলা একাডেমি)
- ০ The Income Tax Law of Bangladesh (বইঘর)

বইগুলো পেতে যোগাযোগ করুন–

বইঘর

[অভিজাত বইয়ের ঠিকানা]

৪৩ ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

দূরালাপনী : ০১৭১১৭১১৪০৯, ০১৭২১১২২৫৬৪

www.nagorikpathagar.org

পলাশী ট্র্যাজেডির ইতিবৃত্ত

ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শিক্ষা এই যে, ইতিহাস থেকে আমরা শিক্ষা নিই না। কথাটি সত্য। অন্তত বাঙালী জাতির জন্য তো বটেই। বাংলার ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ ট্র্যাজেডি হল পলাশীর যুদ্ধ। এই যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে শুধু বাংলার নয়; বরং পুরো ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়ে পড়ে। চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের তুলনারহিত এই যুদ্ধের অনিবার্য শিকার হয় বাংলা তথা ভারতবর্ষের মুসলিম সম্প্রদায়। কিন্তু সাত সমুদ্র তের নদীর ওপার থেকে আসা তস্কর ইংরেজ বেনিয়ার দল তাদের এদেশীয় দেশদ্রোহী কপটাচারীদের প্রত্যক্ষ মদদ ও সহযোগিতায় কেবল মুসলমানদেরকে সর্বস্বান্ত করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং হাজার বছরের সমৃদ্ধ ভারতবর্ষের শিরদাঁড়া ভেঙে গুঁড়ো করে দেয়। পলাশী যুদ্ধের ফলাফল প্রসঙ্গে পরে যাচ্ছি। কিন্তু বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে এত যে, ব্যাপক প্রভাব বিস্তারকারী ঘটনা, সেটি থেকে শিক্ষা গ্রহণ তো দূরের কথা, বরং ইতিহাসের বাঁক ফেরানো মর্মন্তুত এ ঘটনাটি যেন অনেকটাই উপেক্ষার বিষয় হয়ে আছে।

প্রতি বছর ২৩শে জুন আসে এবং আর দশটি সাধারণ দিনের মতো নীরবেই চলে যায়। এমনটিই হয়ে আসছে বিগত দুই শতাধিক বছর ধরে। অথচ ২৩শে জুন আমাদের স্বাধীনতা হারানোর দিন, ভারতবর্ষের ভাগ্য বিপর্যয়ের সূচনার দিন এবং বিশেষত ভারতবর্ষের মুসলমানদের নাম নিশানা নিশ্চিহ্নের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের ভয়াবহ স্মারক এই দিনটি। এটি একদিকে জগৎ শেঠ, রায় দুর্লভদের দ্বারা স্বদেশের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতার দিন, অপরদিকে নবাব সিরাজদ্দৌলার মত দেশপ্রেমিক বীরের 'শির দেগা নেহি দেগা আমামা' মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে দেশ মাতৃকার জন্যে জীবন বিসর্জনের দিন। এটি যেমন স্বাধীনতা হারানোর দিন, ঠিক তেমনি স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে বজ্র শপথ গ্রহণেরও দিন।

২০১৩ সালের ২৩শে জুন পলাশী বিপর্যের ২৫৬তম বর্ষপূর্তি। অর্থাৎ দেশ মাতৃকার বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার ২৫৬তম বছর পার করতে যাচ্ছি আমরা কিন্তু

—২

www.nagorikpathagar.org

ভয়াবহ এই ঘটনা থেকে যে শিক্ষাটুকু নেয়া আবশ্যক ছিল তার অংশ বিশেষও নিইনি আমরা। আর এ কারণেই দেশ মাতৃকার স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব এবং সামগ্রিক স্বার্থ এখনও আমাদের কাছে যথেষ্ট গুরুত্ববহ বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। একটি জাতির জন্য এরচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর কিছুই হতে পারে না। পলাশী যুদ্ধের মতো এ গ্লানিকর ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি রোধ এবং সকলকে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে পলাশী যুদ্ধের ইতিহাসের পূর্বাপর নিয়ে এ পর্যায়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

www.nagorikpathagar.org

পলাশী যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও ইতিহাস

পলাশী যুদ্ধের প্রেক্ষাপট আলোচনা করার আগে আমরা একটু দৃষ্টি ফেরাতে চাই ভারতবর্ষে মুসলমানদের ইতিহাসের সূচনা পর্বের দিকে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়ই ভারতবর্ষ ইসলামের খানিকটা সন্ধান পেয়েছিল। মালাবার (বর্তমান কেরালা) রাজ্যের হিন্দু রাজা চেরুমাল স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করে একটি প্রতিনিধি দলসহ বিশ্বনবী (সা.)-এর দরবারে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন (শায়খ জয়নুদ্দিন, তুহ্ফাতুল মুজাহিদিন ফী বা'যে আহওয়ালির বারতাকালিন এবং মুহম্মদ মতিউর রহমান, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ)। পরবর্তীকালে খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলে আরব মুসলমান বণিকগণ সমুদ্র পথে ভারতের দক্ষিণাংশ (মালাবার, বর্তমান কেরালা রাজ্য) স্পর্শ করে চীন পর্যন্ত যাতায়াত করতেন। যার উদ্দেশ্য ছিল দু'রকমের-বাণিজ্য ও ইসলাম প্রচার। এ প্রক্রিয়ায় এ ভূ-খণ্ডে প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলামের আদর্শ প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে খলিফা হাজ্জাজ বিন ইউসুফের শাসনামলে মুসলমানদের একটি জাহাজ সিন্ধুর রাজা দাহিরের আওতাধীন সমুদ্র সীমায় ডাকাত দল কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়। হাজ্জাজ দাহিরের কাছে এ ঘটনার প্রতিকার চান। কিন্তু রাজা দাহির এ বিষয়ে কোনোরূপ কর্ণপাত করেননি। ফলে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বাধ্য হয়ে ৭১২ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে একটি সেনাদলকে সিন্ধু অভিযানে প্রেরণ করেন। মুসলিম সেনাদল স্থানীয় নির্যাতিত জনগণের সমর্থন ও সহযোগিতায় অত্যাচারী রাজা দাহিরকে পরাস্ত করেন এবং ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন– যা পরবর্তীকালে সমগ্র ভারতব্যাপী বিস্তৃত হয়। হাজার বছর ধরে বর্ণবৈষম্যের কুপ্রথায় জর্জরিত এবং অন্যান্য নানা দিক দিয়ে অনগ্রসর ভারতবাসী ইসলামের সাম্য, শান্ত, সৌম্য ভুবনে প্রবেশ করে আবে হায়াত লাভ করে। কিন্তু এর পাশাপাশি আরো দুটি চিত্র দৃশ্যপটে বিরাজমান ছিল।

এক. শাসন ও শোষণ করার ক্ষমতা হারানো অপশক্তিসমূহের অন্তর্নিহিত বিষজ্বালা, যা ক্রমশই বিষবৃক্ষ রূপে বেড়ে উঠছিল।

দুই. সময়ের পরিক্রমায় মুসলিম শাসক গোষ্ঠি ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

মুসলিম বিজয়ের অব্যাবহিত পূর্ববর্তী শাসক গোষ্ঠী অবশ্য তাদের অন্তরে লালিত বিষজ্বালাকে সুকৌশলে অবদমিত রেখে উল্টো মুসলিম শাসকদের বিশেষ আনুকূল্য নিয়ে দিনে দিনে শক্তি সঞ্চয় করছিল। আর মুসলমানগণ ছিলেন এ বিষয়ে পুরোপুরি গাফেল। তবে মুসলিম শাসকগণ প্রজা-হিত সাধনে এতটাই নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন যে, পুরো মুসলিম শাসনামলে কোথাও কোনো প্রজাকে অসুবিধায় পড়তে হয়নি। বরং সুখে-শান্তিতে পরম আরামেই প্রজা-সাধারণ দিনাতিপাত করতেন। মুসলিম শাসনামলে ভারতের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং প্রজা-সাধারণের সুখ-শান্তি কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছিল। ভারত থেকে একদিকে যেমন বিভিন্ন পণ্য রপ্তানী হত, তেমনি ভারত ছিল তখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের একটি কাঙ্ক্ষিত ঠিকানা।

শুধু তাই নয়, ভারতের ব্যাপারে পৃথিবীর বিভন্ন অঞ্চলের বিশেষতঃ ইউরোপীয়দের আকর্ষণ ছিল সুদূর অতীত থেকেই। আর সব কিছু বাদ দিলেও পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন সভ্যতার ধারক হিসেবে ভারত তো বিশেষ গর্ব করতেই পারে। সেই সূত্র ধরে পঞ্চদশ শতকের শেষের দিকে ইউরোপীয় বণিকগণ ভারতবর্ষে আসেন। প্রথমে আসেন পর্তুগিজরা। ১৪৮৭ খ্রি. পর্তুগিজ নাবিক বার্থালোমিও দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করেন। পর্তুগিজ রাজা ইন্মানুয়েলের পৃষ্ঠপোষকতায় পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো দা গামা ১৪৯৭ খ্রিস্টাব্দে উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করেন এবং আরব নাবিকদের সহযোগিতায় ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দের ২০ বা ২৭শে মে ভারতবর্ষের মালাবার উপকূলে কালিকট বন্দরে উপস্থিত হন। কালিকটের হিন্দু রাজা জামুরিন তাঁকে অভ্যর্থনা এবং আশ্রয় দেন। কোনো বিদেশীকে আশ্রয় প্রশ্রয় দানের ঘটনায় মুসলমানগণ ক্ষুব্ধ হন এবং প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেন। ফলে তিন মাস অবস্থানের পর ভাস্কো দা গামা ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য হন। কিন্তু ১৫০৫ সালে ফ্রান্সিসকো দ্য আলমিডা পনেরশ' পর্তুগিজ নাবিকসহ ভারতবর্ষে আসেন এবং ওই হিন্দু রাজা জামুরিনকে পরাজিত করে মালাবার উপকূলে পর্তুগিজ আধিপত্য স্থাপন করেন। ১৫০৫–১৫০৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মালাবার উপকূলে তার এ আধিপত্য বহাল ছিল। তিনি নৌবহর গঠনের মাধ্যমে ভারতে পর্তুগিজ সাম্রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা করেন যা Blue water policy নামে পরিচিত। ১৫০৯ খ্রিস্টাব্দে আলমিডা মারা যান। আলমিডার মৃত্যুর পর ১৫০৯ খ্রিস্টাব্দে আলফ্যালেমু দ্য আলবুকার্ক নামে অপর এক পর্তুগিজ নাবিক মালাবার উপকূলে প্রভাব বিস্তার করেন এবং ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিজাপুরের সুলতানের নিকট গুয়া বন্দর দখল করে উপমহাদেশে প্রথম পর্তুগিজ উপনিবেশ স্থাপন করেন। ১৫১৫ খ্রিস্টাব্দে

আলবুকার্ক মারা যান। ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগাল স্পেনের অন্তর্ভুক্ত হলে ভারতবর্ষে পর্তুজিজদের ক্ষমতা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। পর্তুগিজদের পর ভারতে আসে ওলন্দাজরা। ১৬০২ খ্রিস্টাব্দে তারা ভারতবর্ষে আসে এবং ১৭৫৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিকট পরাজয়ের মাধ্যমে ভারত থেকে তারা তাদের ব্যবসা বাণিজ্য গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়।

এদিকে মুসলিম শাসনাধীন ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্র থেকে জ্ঞাত হয়ে এখানে বাণিজ্য করার জন্য লন্ডনে গঠিত হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। তারা প্রাচ্যে বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে ব্রিটেনের রাণী প্রথম এলিজাবেথ থেকে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের ৩১ শে ডিসেম্বর পনের বছর মেয়াদী বাণিজ্যাধিকার সনদ লাভ করে। এই সনদ বলে প্রথম কয়েক বছরে কোম্পানী সুমাত্রা, মালাক্কা ও যবদ্বীপে পৃথক পৃথক কয়েকটি বাণিজ্য জাহাজ প্রেরণ করে। ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমসের আদেশে ক্যাপ্টেন হকিংস ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের (১৬০৫–১৬৮৭ খ্রি.) দরবারে আগমন করেন এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। হকিংস-এর দূতিয়ালীতে ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর কর্তৃক মুম্বাইয়ের অদূরে সুরাট বন্দরে ইংরেজদের একটি কুঠি স্থাপনের অনুমতি মিলে। অবশ্য নানাবিধ প্রতিকূলতার কারণে কুঠিটি স্থাপিত হয় ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে। ইংরেজদের প্রতি সম্রাটের সুনজর বৃদ্ধির আশায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সম্রাটের দরবারে একজন বিশেষ দূত প্রেরণের জন্য লন্ডনের কাছে আবেদন জানায়। সেই মুতাবেক ইংল্যান্ডর রাজা ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে টমাস রো-কে জাহাঙ্গীরের দরবারে পাঠান এবং দূত হিসেবে তিনি আজমির, মন্ডু ও আহমেদাবাদে তিন বছর অবস্থান করেন। তার কৌশল ও চেষ্টায় ভারতের আরও কয়েকটি জায়গায় ইংরেজদের বাণিজ্য সুবিধা সম্প্রসারিত হয়। পরবর্তী উল্লেখ্যযোগ্য ঘটনাটি ঘটে সতের শতকের মাঝামাঝি (১৬৪৪–৫০ খ্রি.) সম্রাট শাহজাহানের শাসনামলে। তিনি তখন দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করছিলেন। একদিন তার কন্যার পরিধেয় বস্ত্রে আগুন লেগে প্রায় সমস্ত শরীর দগ্ধ হয়ে যায়। দেশীয় চিকিৎসায় তেমন অগ্রগতি না হওয়ায় সুযোগ নেন সুরাট বন্দরে অবস্থানরত ইংরেজ চিকিৎসক গাব্রিয়েল বাউটন। তার চিকিৎসায় সম্রাট-কন্যা আরোগ্য লাভ করেন। কৃতজ্ঞ সম্রাট শাহজাহান ডাক্তার বাউটনের অনুরোধে ইংরেজ কোম্পানিকে বাংলাদেশে আংশিক বাণিজ্যের অধিকার প্রদান করেন। এ ফরমান নিয়ে ডাক্তার বাউটন যখন বাংলায় আসেন তখন বাংলার সুবেদার ছিলেন সম্রাট শাহজাহানের পুত্র শাহজাদা সুজা– যার পারিবারিক চিকিৎসক হিসেবে বাউটন ১৬৪৫ সাল থেকে তিন বছর কাজ করেন। ব্যক্তিগত সম্পর্কের সূত্র ধরে বাউটন

বার্ষিক মাত্র তিন হাজার টাকার বিনিময়ে শাহজাদা সুজার নিকট থেকে বাংলাদেশে অবাধ বাণিজ্য সুবিধা আদায় করে নেন। ফলে ইংরেজরা ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে প্রথমে হুগলীতে এবং পরে পাটনা ও কাসিম বাজারে কুঠি স্থাপন করে। এভাবে তারা বাংলাদেশে বিভিন্ন বন্দরে বিনা শুল্কে তাদের অবাধ বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে থাকে। এসময় তারা লন্ডনকে জানায় যে, বাংলাদেশ অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী একটা প্রদেশ যেখানে কাঁচা রেশন, সূক্ষ্ম সূতি বস্ত্র ইত্যাদি কম দামে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং তাদের ব্যবসা এখানে এত লাভজনক হচ্ছে যে, তার সম্প্রসারণ ও অতিরিক্ত গুদাম ঘর নির্মাণ করতে হবে। বাংলাদেশের ব্যাপক বাণিজ্যের সম্ভাবনায় কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের নির্দেশে ১৬৫৭ খ্রি. মাদ্রাজে ফোর্ট সেন্ট জর্জ থেকে পৃথক করে বাংলায় একটি স্বাধীন বাণিজ্য এজেন্সি খোলা হয়। ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলার রেশম কেন্দ্র খ্যাত কাশিম বাজারে ইংরেজদের কুঠি স্থাপিত হয়। 'সোরা' সংগ্রহের জন্য পাটনায় কুঠি স্থাপিত হয় ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে। মসলিন বস্ত্রের জন্য ১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় কুঠি স্থাপন করেন। প্রসিদ্ধ কুশা মলমল প্রভৃতি সুতি বস্ত্রের জন্য মালদহে কুঠি স্থাপিত হয় ১৬৭৬ সনে। ১৬৯০ সনে কলকাতায় স্থাপিত হয় কোম্পানির প্রধান বাণিজ্য কুঠি ও স্থায়ী বসবাস।

পরবর্তীতে সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলে কোম্পানি ১৬৭০ সালে আওরঙ্গজেবের কাছ থেকে আরো একটি ফরমান লাভ করে। কিন্তু এই ফরমানের ব্যাখ্যা নিয়ে কোম্পানি ও নবাব সরকারের কর্মচারিদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। শায়েস্তা খান তখন বাংলার সুবেদার। কোম্পানির মতে শুধু সুরাট বন্দরে তাদের মালামালের উপর শুল্ক সরকারের প্রাপ্য-তাও নামমাত্র। অন্যদিকে নবাবের কর্মচারীদের ভাষ্যমতে সুরাটসহ ভারতের অন্য সব বন্দর থেকেই কোম্পানির মালামালের উপর শুল্ক আদায় করা হবে। কোম্পানির এজেন্টরা এই সমস্যা সমাধানের জন্য বিলাতে কোর্ট অব ডিরেক্টরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে কোর্ট **প্রতিকূল অবস্থায় নবাব কর্মচারীদের ঘুষ দানের মাধ্যমে** বিষয়টি ফয়সালা করার পরামর্শ দেয়। এভাবে **ইংরেজরাই প্রথম ঘুষ প্রদানের মাধ্যমে এদেশে দুর্নীতি বিস্তারের চেষ্টা করে**। কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হয়নি। নবাব শায়েস্তা খান নতুন ফরমান প্রাপ্তির ব্যাপারে দিল্লির দরবারে কোম্পানির পক্ষে কথা বলার সুযোগই দিলেন না। ফলে কোম্পানির অবাধ ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেল, নবাব কর্মচারীরা তাদের মতো শুল্ক আদায় করে চললো।

এদিকে ইংরেজ বণিকরা ভারতবর্ষে অবস্থানকালে ইত্যবসরে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্বল দিকগুলো সম্পর্কে ধারণা অর্জন করছিল। এ পর্যায়ে ১৬৮৫

www.nagorikpathagar.org

খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা নবাব সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে।

ইংল্যান্ড থেকে ক্যাপ্টেন নিকলসনকে ৬০০ সৈন্যসহ ১০টি জাহাজের অধিনায়ক করে পাঠানো হয়। মাদ্রাজে অবস্থানরত কোম্পানির আরো ৪০০ সৈন্য তাদের সাথে যোগ দেয়। নিকলসনকে চট্টগ্রাম দখল করে পূর্বাঞ্চলীয় বাণিজ্যের স্থায়ী কেন্দ্র স্থাপনের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রথমে তারা হুগলী বন্দর আক্রমণ করে টিকতে না পেরে পিছু হটে সুতানুটি গ্রামে আশ্রয় নেয়। অন্যদিকে সুরাট বন্দরে কোম্পানির এজেন্ট স্যার জন চাইল্ড মুঘলদের পণ্য ও হজ যাত্রীবাহী জাহাজ আক্রমণ করে বসে। সম্রাট আওরঙ্গজেব ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে ভারতীয় সবকটি কুঠি থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করেন এবং ভারতভূমি থেকে ইংরেজ কোম্পানিকে সমূলে উচ্ছেদের সক্রিয় চিন্তা শুরু করেন।

পরাজিত ইংরেজ প্রতিনিধি জর্জ ওয়েল্ডন এবং আব্রাহাম নভোরাকে হাতে রশি লাগিয়ে দিল্লির দরবারে আওরঙ্গজেবের কাছে হাজির করা হয়। সম্রাট তাদের এক লাখ পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড জরিমানা করেন এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ আদায় করেন। ভবিষ্যতে সদাচরণের প্রতিশ্রুতি দিলে এবং বাণিজ্যের পূর্বশর্ত মেনে চলার অঙ্গীকার করায় আওরঙ্গজেব শেষ পর্যন্ত তাদের ক্ষমা করেন। পরবর্তীতে সম্রাটের ক্রোধের উপশম হলে বার্ষিক তিন হাজার টাকা নজরানার বিনিময়ে পুনরায় তাদের বাংলাদেশে বাণিজ্য করার অনুমতি প্রদান করা হয়। ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে পণ্যদ্রব্যের উপর শতকরা ২ টাকা শুল্ক ছাড়াও দেড় টাকা জিজিয়া কর প্রদানের অঙ্গীকার নিয়ে সমগ্র সাম্রাজ্যে ইংরেজদের অবাধে বাণিজ্য করার অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু স্থানীয় মুঘল কর্মচারীদের সাথে বিরোধের জের ধরে হুগলীর কুঠিয়াল সাহেবরা তাদের কুঠি সুরক্ষিত করে হুগলী দখল করে। ফলে বাংলার তৎকালীন সুবেদার শায়েস্তা খান হুগলী দখল করে ইংরেজদের বাংলা থেকে বিতাড়িত করেন। এদিকে বিচক্ষণ ইংরেজ জব চার্নক সম্রাট আওরঙ্গজেবের অনুমতি নিয়ে বর্তমান কোলকাতার শোভাবাজার এলাকায় (যা সুতানুটি নামে পরিচিত ছিল) সগোত্রীয়দের নিয়ে ১৬৮৭ সালে বসতি স্থাপন করে। কিন্তু ১৬৮৭ সালে ক্যাপ্টেন হিথের নেতৃত্বে একদল ইংরেজ চট্টগ্রাম বন্দর আক্রমণ করলে মুঘলদের সাথে তাদের পুনরায় সংঘর্ষ শুরু হয়। জব চার্নক সুতানুটি ত্যাগ করতে বাধ্য হন। পরে ১৬৯০ সালে বোম্বাইয়ে আওরঙ্গজেবের সাথে ইংরেজদের চুক্তি হলে জব চার্নক পুনরায় বাংলায় ফিরে আসেন।

১৬৯৫ সালে কিছু কিছু স্থানীয় বিদ্রোহের কারণে আইন শৃঙ্খলার এমন অবনতি হয় যে, বাংলার তৎকালীন সুবেদার ইব্রাহিম খান (১৬৮৯–১৬৯৭) বিচলিত হয়ে

www.nagorikpathagar.org

বিদেশী কোম্পানিগুলোকে তাদের স্ব স্ব প্রধান কুঠিতে দুর্গ নির্মাণ করে নিজেদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করার অনুমতি দেন। এই সুযোগে কোম্পানী ১৬৯৬ সালে সুতানুটি কুঠিতে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ স্থাপন করে এদেশে রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপনের প্রথম ভিত্তি স্থাপন করে। ফলে তাদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১৬৯৭ সালে আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম-উস-শান বাংলার সুবেদার হয়ে আসেন। তার আমলে ১৬৯৮ সালে ১৬ হাজার টাকা ঘুষের বিনিময়ে বার্ষিক মাত্র ১২শ' টাকা খাজনা প্রদানের অঙ্গীকারে ইংরেজরা কোলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর নামক তিনটি গ্রামের জমিদারী অর্থাৎ খাজনা আদায়ের অধিকার লাভ করে। এটাই পরবর্তীতে মহানগরী কোলকাতায় রূপান্তরিত হয়।

১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ইংরেজদেরকে তার দেয়া ফরমানের মেয়াদও শেষ হয়ে যায়। এ সময় বাংলার নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ (১৭০৫–১৭২৭ খ্রি) কাশিম বাজার, রাজমহল ও পাটনায় ইংরেজ কুঠি বন্ধ করে দেন। কিন্তু দিল্লির সম্রাট ফররুখ শিয়ারকে (১৭১৩–১৯ খ্রিস্টাব্দ) চিকিৎসা প্রদানের ফাঁদে ফেলে ইংরেজ ডাক্তার হ্যামিলটন ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে একটি বিশেষ ফরমান লাভ করেন– ঐতিহাসিক ওরমী যাকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ম্যাগনাকার্টা বা মহাসনদ নামে অভিহিত করেছে। এ ফরমানে ইংরেজদের যে সকল সুযোগ সুবিধা হয়, সেগুলোর সংক্ষিপ্ত চিত্র নিম্নরূপ–

১. বার্ষিক তিন হাজার টাকা প্রদানের শর্তে বাংলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার।

২. কলকাতা, সুতানুটি, গোবিন্দপুর– এই তিনটি গ্রাম ছাড়াও পার্শ্ববর্তী আরও আটত্রিশটি গ্রামের উপর জমিদারী স্বত্ব কেনার অনুমতি।

৩. কোম্পানির মালামাল চুরি হলে তা ফেরত পাবার অধিকার এবং চোরকে শাস্তি দেবার বিধান।

৪. মাদ্রাজের টাকা বিনা বাটায় বাংলায় প্রচলন।

৫. মূল সনদ স্থানীয় কর্মচারীদের না দেখাবার অধিকার।

৬. কোম্পানির পলাতক খাতককে কোম্পানির কাছে প্রত্যার্পণের অধিকার।

৭. ফ্যাক্টরি–প্রধান প্রদত্ত দস্তক প্রদর্শনে মাল চেক না করার অধিকার।

৮. মুর্শিদাবাদ টাকশালে কোম্পানির মুদ্রা তৈরির অধিকার।

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু বাংলার নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শাসক। তিনি দিল্লির সম্রাটের ফরমান থাকা সত্ত্বেও ইংরেজদের বাংলায় অবাধ বাণিজ্য এবং নিজস্ব মুদ্রা প্রচলন করতে দেননি। ফলে ইংরেজ বণিকদের সাথে মুর্শিদ কুলি খাঁর প্রকাশ্য সংঘাত শুরু হয়। এ দুঃসাহসের পেছনে ইন্ধন জোগায় দেশীয় কতিপয় হিন্দু জমিদার। ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদ কুলি খাঁর মৃত্যুর পর সুজাউদ্দীন (১৭২৭-১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে) বাংলার সম্রাট হন। তার শাসনামলে জগৎ শেঠ, যশোবান্ত রায়, উমিচাঁদ, রাজা বল্লভ, রায় দুর্লভ, নন্দলালসহ আরও অনেক প্রভাবশালী হিন্দু জমিদার ও রাজকর্মচারী নবাবের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে উঠে। ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে সুজাউদ্দীনের মৃত্যুর পর তার পুত্র সরফরাজ খাঁ নবাব হন- যার দুর্বলতার সুযোগে ওই কুশিলবরা আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে এবং তাদের ইন্ধন ও প্ররোচনায় বিহারের গভর্নর আলীবর্দী খাঁ ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে সরফরাজ খাঁকে পরাজিত করে (কারও কারও মতে হত্যা করে) বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার সিংহাসনে আরোহণের আগে থেকেই মুঘল সম্রাটদের দুর্বলতার সুযোগে মারাঠা বর্গীরা প্রায়ই বাংলায় হানা দিত। এদিকে মুর্শিদাবাদে রাজ-দরবারের ভেতরে একদল বিশ্বাসঘাতক হিন্দু রাজকর্মচারী এবং প্রভাবশালী হিন্দু জমিদাররা ভারতের অন্যান্য জায়গার মতো বাংলায় মুসলিম শাসনের অবসানের জন্য ইংরেজদের সাথে গোপন চক্রান্তে লিপ্ত হয়। এসব চক্রান্ত ষড়যন্ত্রের ভেতর দিয়েই আলীবর্দী খাঁর দীর্ঘ ষোল বছরের রাজত্বকাল চলে। জমিদার ও রাজা মহারাজাদের প্ররোচনায় ইংরেজ বেনিয়ারা নবাবকে অমান্য করতে থাকে। এ সময়ের দুটি বিশেষ ঘটনা হচ্ছে-

১. নবাব আলীবর্দী খানের শাসনামলের শেষ দিকে ঢাকার দেওয়ান রাজবল্লভকে হিসেবপত্র নিরীক্ষার জন্য কাগজপত্রসহ মুর্শিদাবাদে ডেকে পাঠানো হয়। তাঁর বিরুদ্ধে তহবিল তসরুপের প্রামাণ্য অভিযোগ ছিল। কিন্তু বিপদের আশঙ্কা করে হিসেব পরীক্ষার আগেই তিনি কাশিমবাজার কুঠি প্রধান উইলিয়াম ওয়াটস-এর কাছে তার পুত্র ও পরিজনদের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করেন। রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণবল্লভকে তিপ্পান্ন লাখ টাকা মূল্যের নগদ অর্থ ও সোনা-রূপাসহ কলকাতায় আশ্রয় দেয়া হয়। এই কৃষ্ণবল্লভকে প্রত্যার্পণের জন্য নবাবের দরবার থেকে বারবার নির্দেশ ও তাগিদ দেয়া সত্ত্বেও কোম্পানির গভর্নর রজার ড্রেক (জড়মবৎ উৎধশব) সে আদেশ পালন করতে অস্বীকার করেন।

২. দ্বিতীয় ঘটনাটি হচ্ছে কোম্পানি কর্তৃক কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণের প্রাক্কালে লন্ডনে অবস্থিত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট অব ডাইরেক্টরস কর্তৃক ১৭৫৪ সালের ২৪ নভেম্বর তারিখে কলকাতাস্থ ফোর্ট উইলিয়াম

www.nagorikpathagar.org

কাউন্সিলকে এই মর্মে নির্দেশ দেয়া হয় যে, নবাবের অনুমতি নিয়ে অথবা তাঁর জ্ঞাতসারে যেন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয় এবং কোর্ট অব ডাইরেক্টরস নবাবের অনুমতি আদায়ের জন্য তৎকালীন মুদ্রায় দুই লাখ টাকা ব্যয়েরও মঞ্জুরি প্রদান করে। কিন্তু বাংলার হিন্দু রাজা মহারাজা এবং তাঁদের অনুগত বর্ণ হিন্দু ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সর্বমুখী সহযোগিতা ও সাহায্যের আশ্বাসের প্রেক্ষিতে এবং তাদের অনুপ্রেরণায় উৎসাহী হয়ে কোম্পানির কলকাতাস্থ কর্মকর্তারা লন্ডন কোর্ট অব ডাইরেক্টরদের নির্দেশ উপেক্ষা করে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের নির্মাণ কাজ চালিয়ে যেতে থাকে।

১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৯ই এপ্রিল নবাব আলীবর্দী খাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর আগে হিন্দু রাজা মহারাজা ও রাজ কর্মচারীদের দেশদ্রোহিতা ও ইংরেজদের আগ্রাসী অপতৎপরতার সমাধান করে যেতে পারেননি। এহেন জটিল পরিস্থিতিতে ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৯ই এপ্রিল নবাব আলীবর্দী খাঁর দৌহিত্র ও নয়নের মণি ২৩ বছর বয়সী সিরাজউদ্দৌলা বাংলা বিহার উড়িষ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তরুণ সিরাজের নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম, অসীম বীরত্ব ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতার কারণেই আলীবর্দী খাঁ তাকে বেশি স্নেহ করতেন এবং বাংলা-বিহার উড়িষ্যার রক্ষক হিসাবে তাকে মনোনয়ন দেন। ছোটবেলা থেকেই সিরাজ ছিলেন অসীম সাহসী যোদ্ধা। আলীবর্দী খাঁর জীবদ্দশায় মারাঠা আগ্রসন দমনে তিনি অনেকবার বীরত্বের পরিচয় দেন। ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে আলীবর্দী খাঁ যখন মারাঠা দস্যুদের দমনে ব্যস্ত তখন বিহারে বিদ্রোহ দেখা দিলে সিরাজ অসীম সাহসিকতার সাথে তা দমন করেন। এছাড়া তাঁর সততা ও চারিত্রিক দৃঢ়তাও আলীবর্দী খাঁর আস্থা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

সিংহাসনে আরোহণের মাত্র দেড় মাসের মধ্যে তিনি একই সাথে কৃষ্ণবল্লভকে প্রত্যার্পণ করতে গভর্নর ড্রেককে আদেশ দেন এবং ইংরেজদের ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের সংস্কার বন্ধ করতে বলেন এবং কোলকাতার চারপাশের পরিখা ভরাট করার আদেশ দেন। সিরাজের এ সংক্রান্ত চিঠি-পত্র ইংরেজরা অগ্রাহ্য করে এবং নবাবের প্রতিনিধি পত্রবাহক নারায়ণ সিংকে কোলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ থেকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়া হয়। এরপর নবাব অন্যতম ব্যবসায়ী খাজা ওয়াজিদকে একই উদ্দেশ্যে পুনরায় কোলকাতা পাঠান। তিনি পরপর চারবার কোলকাতা যান। কিন্তু ইংরেজরা তাঁর সাথেও সংযত আচরণ বা আপসমূলক মনোভাব প্রদর্শন করেননি। এভাবে নবাবের আন্তরিক সদিচ্ছা ব্যর্থ হবার ফলে তিনি রায় দুর্লভ ও বেগকে কাশিম বাজার কুঠি অবরোধ করতে নির্দেশ দেন। মীর মোহাম্মদ রেজা খান হুগলীতে জাহাজ নির্মাণের পথ রোধ করলেন এবং

www.nagorikpathagar.org

এভাবে কাশিম বাজার কুঠির পতন ঘটে। কুঠি প্রধান উইলিয়াম ওয়াটস নবাবের সামনে হাজির হয়ে অঙ্গীকার করেন যে, দুর্গের সম্প্রসারণ বন্ধ করা হবে, কোলকাতায় এ দেশীয় কাউকে আশ্রয় দেয়া হবে না এবং এ দেশীয় বণিকদের কোনো দস্তক সরবরাহ করা হবে না।

কিন্তু কোম্পানি প্রধান ড্রেক, ওয়াটস-এর সাথে একমত না হওয়ায় সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে। ১৭৫৬ সালের ১৩ জুন নবাব ফোর্ট উইলিয়াম পৌঁছান এবং কোলকাতা অবরুদ্ধ করেন। ১৯ জুন কোলকাতা নাটকের অহংকারী নায়ক রজার ড্রেক তার সঙ্গীদের নিয়ে পেছন দিক দিয়ে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেন। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ শিবিরে পলায়নের হিড়িক পড়ে যায়। এক ঘণ্টার মধ্যে ইংরেজদের সকল জাহাজ পলাতকদের নিয়ে ভাটিপথে পাড়ি জমায়। ২০ জুন, ১৭৫৬ তারিখে কোলকাতার পতন ঘটে।

ইংরেজরা পরাজয় বরণ করে সন্ধি করতে বাধ্য হয়। সেনাপতি মীন জাফর আলী খাঁ এবং অন্যান্য গণ্যমান্য পাত্র-মিত্রসহ নবাব সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজ দুর্গে পদার্পণ করেন। দুর্গে পাদার্পণ করার পর তিনি উমিচাঁদ ও কৃষ্ণবল্লভকে তাঁর সামনে হাজির করার নির্দেশ প্রদান করেন। উমিচাঁদ ও কৃষ্ণবল্লভ সসম্ভ্রমে নবাবের সামনে উপস্থিত হলে নবাব তাদের প্রতি কোনো কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। যে কৃষ্ণবল্লভকে নিয়ে এত গোলযোগ তাকে হাতে পেয়েও নবাব কেন তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া থেকে বিরত ছিলেন তা বোধগম্য নয়। তবে ঐতিহাসিকগণ অনেকেই এই মর্মে মত প্রকাশ করেন যে, ইংরেজদের সাথে সন্ধি চুক্তি স্থাপন করার সময় রাজবল্লভ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করার কারণে সিরাজউদ্দৌলা কৃষ্ণবল্লভের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েন এবং তার সকল অপরাধ ক্ষমা করে দেন।

২০ জুন ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে সিরাজের হাতে কলকাতা পতনের ঘটনায় ইংরেজরা সিরাজের ওপর ভয়ানক ক্ষিপ্ত হয়। প্রশ্ন জাগতে পারে একটি স্বাধীন দেশে স্রেফ ব্যবসা করতে আসা কতিপয় বিদেশী বণিকদের এত স্পর্ধা আসে কোথা থেকে? উত্তর একবারেই সোজা। দেশদ্রোহী হিন্দু রাজকর্মচারী এবং জমিদার ও রাজা মহারাজাদের অব্যাহত চক্রান্ত ষড়যন্ত্র ও আশ্রয় প্রশয়। যাই হোক, ইংরেজ ঐতিহাসিক হলওয়েল সিরাজের চরিত্রে কালিমা লেপন ও তার বিরুদ্ধে সকলকে উস্কে দিতে অন্ধকূপ হত্যার মত এক চরম মিথ্যা কাহিনী প্রচার করতে থাকেন। নবাব সিরাজ নাকি ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ পতনের পর (২০ জুন ১৭৫৬ খ্রি.) আত্মসমর্পণকারী ১৪৬ জন ইংরেজকে দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও গভীরতায় যথাক্রমে ১৮,

১৪ ও ১০ ফুট আয়তনের জানালাবিহীন একটি কক্ষে সারা রাত আটকে রাখে এবং তাতে নাকি দম বন্ধ হয়ে ১২৩ জন মারা যায়। ইংরেজদের সাজানো এই ঘটনাটি ইতিহাসের চরম মিথ্যাচার হিসাবে পরবর্তীকালে প্রতিভাত হয়েছে। এদিকে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ পতনের খবর পেয়ে মাদ্রাজে অবস্থানরত রবার্ট ক্লাইভ ইউরোপ থেকে আসা দুই হাজার সৈন্য ও আধুনিক গোলাবারুদসহ কলকতায় পৌছায় এবং ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২ জানুয়ারি ইংরেজরা কলকাতা পুনর্দখল করে।

এরপর ড্রেক কোলকাতা থেকে নবাবের বিরুদ্ধে এক ঘোষণা প্রচার করে যা যুদ্ধ ঘোষণারই সামিল। এ ঘোষণায় বলা হয়–

> We do hereby on behalf of the East India Company and as their representatives in Bengal, in consideration of the Several acts of hostility and violence already Premised, declare open war against the Sirajuddaullah and against the subjects of the said Subah (Nabab), their towns. shipping and effects according to the maxims and rules of all nations, until ample restirution be made to the East India Company, their servants, tenants and inhabitants residing under their protection for all damages and loss sustained by them...

এই ঘোষণার পর সিরাজউদ্দৌলা ২০ জানুয়ারি ১৭৫৭ পুনরায় কোলকাতা দখল করেন এবং মানিক চাঁদকে কোলকাতার দায়িত্বে রেখে হুগলী অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু **মানিকচাঁদ ঘুষের বিনিময়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে কোলকাতা ইংরেজদের হাতে তুলে দেয়**। এ ষড়যন্ত্রে মানিকচাঁদ একা ছিল না। এ ষড়যন্ত্রের মূল হোতা ছিলেন জগৎ শেঠ ও রাজবল্লভ। তাদের সাথে ছিল উমিচাঁদ, রায়দুর্লভ ও নন্দকুমারসহ আরো অনেকে। ঘটনার আকস্মিকতায় সিরাজ কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়েন। ঠিক এরকম সময় আফগান অধিপতি আহমদ শাহ আবদালী মধ্যভারতে বিভিন্ন নগর, শহর দখল করে চলেছেন। এই আবদালী কর্তৃক এক পর্যায়ে মুর্শিদাবাদ আক্রমণের হুমকি সিরাজকে বিচলিত করে তোলে। অপরদিকে ইংরেজরা নবাবের সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য এদেশের কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বকে হাত করার উদ্দেশ্যে কিছুটা সময়ের প্রয়োজন অনুভব করে। এসব কারণে ১৭৫৭ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি নবাব ও ইংরেজদের মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি হয়। এই চুক্তির শর্তানুযায়ী ইংরেজরা

www.nagorikpathagar.org

কোলকাতা ফিরে পায় এবং ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ মেরামত ও নির্মাণের কাজ করে। এ চুক্তিই আলীনগরের সন্ধি নামে অভিহিত। এ চুক্তির শর্তানুযায়ী সিরাজউদ্দৌলা ১৭১৭ সালের মোঘল বাদশাহের ফরমানের মাধ্যমে ইংরেজদের প্রদত্ত সুবিধাসমূহ মেনে নেন।

আলীনগরের সন্ধি হলে সিরাজউদ্দৌলার সন্তুষ্টির জন্যে কর্নেল ক্লাইভ এক প্রতিজ্ঞাপত্রে সই করেছিলেন। সে প্রতিজ্ঞা পত্রটি ছিল এমন–

'বঙ্গদেশস্থ ইংরেজ স্থল সৈন্যদলের অধিনায়ক আমি কর্নেল ক্লাইভ 'সাবুদজঙ্গ বাহাদুর' ঈশ্বর এবং উদ্ধারকর্তার (যিশু) সামনে এই মর্মে প্রতিজ্ঞাপূর্বক জানাচ্ছি যে, ইংরেজ এবং নবাব সিরাজউদ্দৌলার মধ্যে শান্তি বিরাজ করছে। নবাবের সাথে যে মর্মে সন্ধি হয়েছে, ইংরেজরা তার অক্ষুণ্ন মর্যাদা রক্ষা করবেন। নবাব যতদিন সন্ধি রক্ষা করবেন, ততদিন ইংরেজরা তাঁর শত্রুকে ইংরেজদের শত্রু হিসেবে দেখবেন এবং নবাব যখন চাইবেন, তখনই তাঁকে যথাশক্তি সাহায্য প্রদান করবেন।

তারিখ: ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি।'

কিন্তু ক্লাইভ তার অঙ্গীকার রক্ষা করেননি। তার শঠতাপূর্ণ আচরণ দেশীয় ষড়যন্ত্রকারীদের দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত হয়ে এদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হরণ করছিল।

২ মে ১৭৫৭ ষড়যন্ত্রকারীরা মিলে জগৎশেঠের বাড়িতে গোপন বৈঠকে মিলিত হয়। সেখানে উমিচাঁদ, রায়দুর্লভ, রাজ বল্লভ, মীর জাফর এবং আরো কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগ দেন। ইংরেজ কোম্পানির প্রতিনিধি ওয়াটস পর্দাঘেরা পালকিতে চড়ে জগৎশেঠের বাড়িতে এসে ঐ গোপন বৈঠকে যোগ দেয়। এই বৈঠকেই সিরাজউদ্দৌলাকে সরিয়ে মীর জাফরকে বাংলার মসনদে বসাবার সিদ্ধান্ত হয়। মীর জাফর ছিলেন এই ঘটনার অপরিণামদর্শী নির্বোধ ক্রীড়নক। ওয়াটস ষড়যন্ত্রমূলক এ কাজে ইংরেজদের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন। এরপর কোম্পানি প্রধানগণ চুক্তিপত্রের খসড়া প্রস্তুত করেন এবং ১৯ মে ১৭৫৭ তারিখে এতে সই করেন। মীর জাফর সই করেন ৪ জুন ১৭৫৭ তারিখে। চুক্তি অনুযায়ী তিনি ইংরেজদেরকে সৈন্য দিয়ে সাহায্যের বিনিময়ে কয়েকটি বাণিজ্য সুবিধা দিতে স্বীকার করেন এবং ইংরেজ সৈন্যদের ব্যয়ভার বহনসহ কোম্পানির ক্ষতিপূরণ বাবদ দুই কোটি টাকা দিতে সম্মত হন। এছাড়াও উমিচাঁদকে ৩০ লাখ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়।

www.nagorikpathagar.org

এদিকে উমিচাঁদকে প্রতারিত করার জন্য ক্লাইভ চুক্তিপত্রের দু'টি খসড়া প্রস্তুত করে। মূল খসড়ায় উক্ত ত্রিশ লাখ টাকার কথা ছিল না।

সিরাজের প্রধান সেনাপতি মীর জাফর আলী খান ছিলেন তার নানা আলীবর্দী খার ভগ্নিপতি। অর্বাচীন ও নির্বোধ এই ব্যক্তিটি নবাব হবার লোভে হিন্দু ও ইংরেজদের সম্মিলিত ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পা রাখেন । দেশ বিরোধী চক্রান্তের গন্ধ পেয়ে সিরাজ তাকে একবার বরখাস্ত করে জনৈক আব্দুল হাদী খানকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন। কিন্তু নিজেদের চক্রান্ত ভেস্তে যাবার আশংকায় জগৎ শেঠ, রায় দুর্লভরা মীর জাফরের পক্ষাবলম্বন করেন। তাদের বিশেষ সুপারিশে সিরাজ তাকে ক্ষমা করে পুনরায় প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব দেন এবং দেশ মাতৃকার স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় তাকে পবিত্র কুরআন শরীফ হাতে নিয়ে শপথ করান। শুধু তাই নয়, একই উদ্দেশ্যে তিনি উমি চাঁদদেরকেও তাদের ধর্মগ্রন্থ নিয়ে শপথ করিয়েছিলেন। কিন্তু চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী। তারা নবাব সিরাজকে সিংহাসচ্যুত করতে ইংরেজ কাউন্সিলার ও সৈন্য দলকে এর আগেই প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির অতিরিক্ত আরও পঞ্চাশ লাখ টাকা দেবার গোপন চুক্তি করেন। এই সুযোগে ইংরেজরা ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জুন নবাব সিরাজকে অস্বীকার করে চরম পত্র দেন।

এদিকে ১২ জুন কোলকাতার ফৌজ চন্দননগরের ফৌজের সাথে মিলিত হয়। চন্দননগর দুর্গের নিরাপত্তা রক্ষায় মাত্র দেড়শ' সৈন্যকে নিযুক্ত করে ১৩ জুন পুরো বৃটিশ বাহিনী যুদ্ধযাত্রা করে। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়ের বর্ণনা থেকে জানা যায়–

> *'গোলা-বারুদ নিয়ে 'গোরা লোগ' দুইশ' নৌকায় আরোহণ করল। কালা আদমীরা গঙ্গাতীরের বাদশাহী রাস্তার ওপর দিয়ে পায়ে হেঁটে এগিয়ে যেতে লাগল। কোলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ অনেক দূর পথ। পথের পাশে হুগলী এবং কাটোয়ার দুর্গে, অগ্রদ্বীপ এবং পলাশীর ছাউনিতে নবাবের সিপাহিসেনা বসে রয়েছে। তারা বীরোচিত কর্তব্য সম্পাদন করলে হয়তো হুগলীর কাছেই ইংরেজরা সসৈন্যে পশ্চাদপদ হতে বাধ্য হতেন। কিন্তু ইংরেজদের গতিরোধ করা দূরে থাক; কেউ একবার বীরের মতো সম্মুখসমরে অগ্রসর হবারও আয়োজন করল না। ইতিহাসে কেবল এই পর্যন্তই দেখতে পাওয়া যায় যে, নবাব পক্ষীয় হুগলীর ফৌজদার ইংরেজদের যুদ্ধজাহাজ দেখে এবং ক্লাইভের তর্জন-গর্জন শুনে নিতান্ত ভীত হয়ে পথ ছেড়ে দিয়েছিলেন। তারা কোনো প্রতিরোধ গড়ে তোলেনি।*

www.nagorikpathagar.org

ইংরেজরা যখন চন্দননগর আক্রমণ করে, মহারাজ নন্দকুমার তখন হুগলীর ফৌজদার। তিনি সে যাত্রা কি কারণে ইংরেজের পথ ছেড়ে দেন, সে কথা নবাবের কানে এসেছিল। সেজন্য তিনি হুগলীতে আর একজন নতুন ফৌজদার পাঠিয়েছিলেন। এই সকল ফৌজদার বা তাদের কালা সিপাহিরা যেমন বীরবক্রিমে অস্ত্রচালনা করত, তা ইংরেজদের অজ্ঞাত ছিল না। তারা জানতেন যে, হুগলীর ফৌজদার পৃষ্ঠদেশে আক্রমণ করলে ইংরেজদের কতটা সর্বনাশ হতে পারতো। কিন্তু ইংরেজদের এই রণযাত্রায় হুগলীর ফৌজদার কোনো প্রতিরোধ গড়ে না তুলে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছিল।' (অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়: সিরাজ উদ্দৌলা)

এদিকে বিদ্রোহের সন্ধান পেয়ে মীর জাফরকে কারারুদ্ধ করার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করে সিরাজউদ্দৌলা তাঁকে স্বপক্ষে টেনে আনার আয়োজন করতে লাগলেন। অনেকে বলেন যে, সিরাজউদ্দৌলার অদূরদর্শিতার এটাই উৎকৃষ্ট নিদর্শন। কিন্তু সে সময়ে সিরাজউদ্দৌলা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ব্যাকুল। সুতরাং কেউ কেউ মীর জাফরকে কারারুদ্ধ করার জন্য উত্তেজিত করলেও সিরাজউদ্দৌলা সে কথায় কর্ণপাত করলেন না। তিনি মীর জাফরের সকল অপরাধ ক্ষমা করে রাজসদনে ডাকলেন। সিরাজউদ্দৌলা ভেবেছিলেন, ইসলামের নামে, আলিবর্দীর নামে, স্বাধীনতা রক্ষার্থে সকল কথা বুঝিয়ে বলতে পারলে হয়তো এখনো মীর জাফরের মতিভ্রম দূর হতে পারে। বিদ্রোহীগণ সিরাজউদ্দৌলাকে অত্যন্ত ভয় করতেন। তাঁরা দেখলেন যে, সব কথা প্রকাশ হয়ে গেছে; সুতরাং নবাবের সঙ্গে পুনরায় সখ্যতা স্থাপন করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। তারা সেরূপ উপদেশ দিতে ত্রুটি করলেন না, কিন্তু মীর জাফর সাহসের অভাবে রাজদরবারে উপস্থিত হলেন না।

বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব সিরাজউদ্দৌলা এবার আর মীর জাফরের আসার অপেক্ষায় বসে থাকলেন না। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নবাব পরিস্কার বুঝতে পারছিলেন যে, বাংলার স্বাধীনতা সূর্য রাহুর কবলে পড়ে যাচ্ছে। জগৎ শেঠ, উমিচাঁদ আর ক্লাইভ-ওয়াটসনদের কবল থেকে বাংলা তথা ভারত মাতার স্বাধীনতা সূর্যকে টিকিয়ে রাখতে হলে মীর জাফরকে যে কোন উপায়ে পাপের পিচ্ছিল পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে। সুতরাং কালবিলম্ব না করে ১৫ জুন স্বয়ং সিরাজউদ্দৌলা মীর জাফরের বাড়িতে উপস্থিত হন।

নবাবকে তার সামনে হাজির হতে দেখে মীর জাফর হতভম্ব হয়ে পড়লেন।

www.nagorikpathagar.org

বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার ব্যাপারে সিরাজের করুণ আরতি তার কানে অনেকটা অনিচ্ছায় হলেও প্রবেশ করতে লাগল। মুখ কাচু-মাচু করে সলজ্জ-নয়নে স্নেহভাজন আত্মীয়-নবাবের মুখের সকরুণ ভর্ৎসনাবাক্যও তাকে শুনতে হলো। অবশেষে সিরাজউদ্দৌলা যখন ক্ষমা প্রদর্শন করে, আল্লাহর নামে, মুহম্মদের নামে, মুসলমান-গৌরবের নামে, আলিবর্দীর বংশমর্যাদার দোহাই দিয়ে, মীর জাফরকে ফিরিঙ্গীর স্নেহবন্ধন ছিন্ন করার জন্য বার বার উত্তেজিত করতে লাগলেন– তখন সব কথাই স্বীকার করতে হলো। তখন আবার 'কুরআন' আসলো। আবার মুসলমানের পরম পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কুরআন শরীফ মাথায় নিয়ে, তিনি জানু পেতে শপথ করলেন

'আল্লাহর নামে, পয়গম্বরের নামে ধর্ম শপথ করে অঙ্গীকার করছি, যাবজ্জীবন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার স্বাধীনতা রক্ষা করব, প্রাণ থাকতে বিদেশী ফিরিঙ্গীর সহায়তা করব না।'

সিরাজউদ্দৌলার সব সন্দেহ দূর হয়ে গেল। একজন হিন্দু যে ব্রাহ্মণের পদ-স্পর্শ করে মিথ্যা বলতে পারে, সে কথা সিরাজউদ্দৌলা বিশ্বাস করতেন না। তাই একবার উমিচাঁদের ধর্ম-শপথে তিনি প্রতারিত হয়েছিলেন। কিন্তু একজন মুসলমান যে কুরআন মাথায় নিয়ে মিথ্যা কথা বলতে সাহস করবে তা বিশ্বাস করতে না পেরে সিরাজউদ্দৌলা আবার প্রতারিত হলেন। যাহোক, এভাবে গৃহবিবাদের মীমাংসা করে সিরাজউদ্দৌলা সসৈন্যে পলাশী ক্ষেত্রে সমবেত হবার আয়োজন করতে লাগলেন।

এদিকে আগ্রাসী ব্রিটিশ পক্ষ এবং তাদের এদেশীয় দোসর উমিচাঁদ-জগৎশেঠরা মীর জাফরের ব্যপারে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। এ অবস্থায় সোমবার অপরাহ্নে মীর জাফরের কাছ থেকে এক সাথে দু'টি পত্র এল। একটি ক্লাইভের নামে, অপরটি উমর বেগের নামে। উমর বেগ ছিলেন মীর জাফরের বিশ্বস্ত অনুচর। এই উভয় পত্রে সন্দেহ অপসারিত হলো। কিন্তু ব্রিটিশ শিবিরে অশ্বসেনা না থাকায় ক্লাইভের আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠল। তিনি শুনেছিলেন, বর্ধমানের মহারাজের সঙ্গে সিরাজউদ্দৌলার সদ্ভাব নেই। সুতরাং অনন্যোপায় হয়ে তাকে লিখে পাঠালেন, 'আপনার অশ্বসেনা যাই থাকুক, তা নিয়েই আমাদের সঙ্গে মিলিত হোন।'

এই পত্র লিখেও ক্লাইভের দুশ্চিন্তা দূর হলো না। তার আদেশে ২১ জুন মঙ্গলবার সামরিক সভার অধিবেশন হলো। ক্লাইভ বলে গেছেন, এটাই তার জীবনের প্রথম এবং শেষ সামরিক সভা।

www.nagorikpathagar.org

কী কারণে সমগ্র সমর-সভার পরামর্শ উপেক্ষা করে, সহসা ক্লাইভের শৌর্য-বীর্য পুনরায় উজ্জীবিত হয়েছিল, সে বিষয়েও নানারূপ মতভেদ দেখতে পাওয়া যায়। অর্মি বলেন–

'সভা ভঙ্গ হওয়ামাত্র নিকটস্থ গভীর বনে প্রবেশ করে, এক ঘণ্টাকাল গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থেকে, নিজেই বুঝেছিলেন যে, অগ্রসর না হওয়া মূর্খতা! তাই তিনি শিবিরে এসেই আদেশ দিলেন যে, ভোরেই গঙ্গা পার হতে হবে।'

ক্লাইভের বিশ্বস্ত পার্শ্বচর স্ক্রাফটন (Scrafton) লিখেছেন–

> In this doubtful interval the majority of our officers were against crossing the river and everything bore the face of disappointment; but on the 21st of june, the colonel received a latter from meer jaffar, which determined him to hazard a battle and he passed the river at five in the next morning .

তার মানে, ২১ জুন মীর জাফরের পত্র পেয়েই ক্লাইভ ঘুরে বসেছিলেন এবং তার আদেশে ২২ জুন সকাল ৫ টার সময় ব্রিটিশ বাহিনী গঙ্গা পার হয়েছিল।

মীর জাফরের পত্র:

> That the Nabab had halted at Muncara, a Village Six Miles to the South of Cassimbazar and intended to entrench and wait the evening at that place, where jaffar proposed that the english should attack him by surprise, marching round by the inland part of the island.

ক্লাইভের উত্তর:

> That the should march to Plassey without delay and would the next morning advance six miles further to the village of Daudpoor; but if meer jaffar did not join him there he would make peace with the Nabab.

স্টুয়ার্ট, ম্যালকম এবং মেকলে সকলেই অর্মির লেখা ইতিহাস থেকে প্রমাণ গ্রহণ করেছেন যে, ২১ জুন অপরাহ্ন ৪ টায় ক্লাইভ মীর জাফরের কাছ থেকে সত্যি সত্যিই পত্র পেয়ে তৎক্ষণাৎ তার উত্তর দেন।

—৩

www.nagorikpathagar.org

ক্লাইভের প্রত্যুত্তরে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি ২১ জুন অপরাহ্ন পর্যন্ত যুদ্ধযাত্রা করেন নি, তবে পত্র পাবার পর যুদ্ধযাত্রা করতে কৃতসংকল্প হয়ে মীর জাফরকে সংবাদ পাঠিয়েছিল। মীর জাফরের উপদেশ না পেয়ে, ইংরেজরা সসৈন্য কাটোয়ায় অপেক্ষা করছিলেন এবং সে জন্যেই সমরসভার অধিবেশন হয়েছিল। মীর জাফরের উপদেশ পাওয়া মাত্র আবার ইংরেজ সেনাপতির শৌর্য-বীর্য জেগে উঠেছিল। ক্লাইভ নিজেও স্বীকার করে গেছেন যে, সমরসভার অধিবেশন শেষ হলে, ২৪ ঘণ্টার বিশেষ গবেষণার পর তার মত পরিবর্তন হয় এবং ২২ জুন সকালে সেনাদল গঙ্গা পার হয়।

www.nagorikpathagar.org

পলাশী যুদ্ধ

পীড়িত সেনাদলকে কাটোয়া দুর্গে সুরক্ষিত করে, অবশিষ্ট ইংরেজ বাহিনী ২২ জুন সকালে ভাগীরথী পার হয়ে, মীর জাফরের বলে দেয়া সঙ্কেত মতো দলে দলে পলাশীর দিকে অগ্রসর হতে লাগল। পলাশী মাত্র সাড়ে সাত ক্রোশ দূরে। পাছে নবাব-সেনা পলাশী অধিকার করে নেয়, সে আশঙ্কায় ইংরেজরা বৃষ্টি বাদল মাথায় করে তাড়াতাড়ি ছুটে চললো এবং রাত একটার সময় পলাশীর আম বাগানে পৌছল।

সিরাজউদ্দৌলা কাশিমবাজার থেকে ৬ মাইল দক্ষিণে মনকরা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তিনি মনকরা ছেড়ে আরো দক্ষিণে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং ভাগীরথী যেখানে অশ্বক্ষুরের ন্যায় এঁকে-বেকে প্রবাহিত, তার পূর্বদিকে তেজনগরের কোলা প্রান্তরের উত্তরাংশে শিবির স্থাপন করেছিলেন। শিবিরের দক্ষিণে খানিকটা উঁচু মাটির প্রাচীর। তার দক্ষিণে মাটির স্তুপ এবং দু'টি পুরনো সরোবর। সিরাজসেনার বাদ্য-বাজনা বহুদূর পর্যন্ত বনভূমিতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। ক্লাইভ বুঝলেন, শত্রু খুব কাছে। সে রাতে বৃটিশ বাহিনী যথাসম্ভব ঘুমিয়ে কাটাল, কিন্তু সেনাপতি আর ঘুমের সুযোগ পেলেন না; কেবল নিরন্তর মনে হতে লাগল– কি হয়, কি হয় রণে, জয় না পরাজয়!

সিরাজউদ্দৌলাও ঘুমের সুযোগ পেলেন না। একাকী নির্জন পটমন্ডপে বসে প্রহর গুণতে গুণতেই রাত ভোর হয়ে গেল। তিনি চিন্তাক্লিষ্ট বিষণ্ন মুখে একাকী আলো-আঁধারিতে বসে আছেন। সুচতুর তস্কর সুযোগ বুঝে তাঁর সামনে থেকে ফরাশ তুলে নিয়ে গেল। সিরাজ ঘুম ভাঙার মতো পেছন পেছন বাইরে এসে দেখেন, তার পরিচারকরা কে কোথায় পালিয়ে গেছে। সিরাজ মর্মপীড়িত কণ্ঠে অলক্ষ্যে বলে উঠলেন–

'হায়! না মরতেই এরা আমাকে মৃতের মধ্যে গণ্য করে নিয়েছে।'

২৩ জুন ১৭৫৭ সাল।

রাত প্রভাত হলো। যে প্রভাতে ভারতগগনে বৃটিশ সৌভাগ্য সূর্য উদিত হবার সূত্রপাত হয়েছিল, সেই প্রভাত। ১১৭০ হিজরী ৫ শাওয়াল, বৃহস্পতিবার পলাশী প্রান্তরে ইংরেজ ও বাঙালী শক্তি পরীক্ষার জন্য একে একে শয্যা ছেড়ে উঠতে লাগল।

www.nagorikpathagar.org

ইংরেজরা যে আম বাগানে সেনা সমাবেশ করেছিলেন তার নাম 'লক্ষবাগ'– লোকে বলে তা লক্ষ গাছে পরিপূর্ণ ছিল। এই আম বাগানের পশ্চিম উত্তর কোণে লক্ষবাগের উত্তরে খোলা প্রান্তরে ব্যূহ রচনা করলেন। সিরাজউদ্দৌলা ভোরেই মীর জাফর, ইয়ার লতিফ এবং রায় দুর্লভকে শিবির থেকে এগিয়ে যাবার অনুমতি দিয়েছিলেন। তাঁরা অর্ধচন্দ্রাকারে ব্যূহ রচনা করে ধীর ও মন্থর গতিতে আম বাগান বেষ্টন করার জন্য অগ্রসর হতে লাগলেন।

ইংরেজদের মনে হলো, এই চক্রব্যূহ যদি আম বাগান বেষ্টন করে কামানে অগ্নিসংযোগ করে, তাহলে সর্বনাশ। ক্লাইভের সেনাবাহিনী চার দলে বিভক্ত হয়ে মেজর কিলপ্যাট্রিক, মেজর গ্রান্ট, মেজর কূট এবং কাপ্তান গপের অধীনে অস্ত্রধারণ করল। মীর মর্দনের সিপাহি সেনা সামনের সরোবর তীরে সমবেত হয়েছিল। এক পাশে ফরাসী বীর সিনফ্রে, অপর পাশে বাঙালী বীর মোহনলাল, মাঝখানে বাঙালি সেনাপতি মীরমর্দন সেনাচালনার ভার গ্রহণ করলেন।

সিরাজ-বাহিনীর রণহস্তী, সুশিক্ষিত অশ্বসেনা যখন সুগঠিত আগ্নেয়াস্ত্রসহ ধীরে ধীরে সামনে অগ্রসর হতে লাগল, তখন ইংরেজরা ভাবলো– সিরাজব্যূহ দুর্ভেদ্য। সকাল ৮ টায় মীরমদন সরোবর তীরে কামানে অগ্নিসংযোগ করলেন। প্রথম গোলাতেই ইংরেজপক্ষে একজন নিহত এবং একজন আহত হলো। তার পর মুহুর্মুহু কামান চলতে লাগল আর একের পর এক ইংরেজসেনা ধরাশায়ী হতে লাগল। এভাবে আধ ঘণ্টা যুদ্ধ চলল। এই আধা ঘণ্টায় ১০ জন গোরা ও ২০ জন কালা সিপাহি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। ইংরেজদের কামানও নীরব ছিল না। তার প্রচন্ড আঘাতে নবাবসেনারাও ধরাশায়ী হচ্ছিল। কিন্তু তাতে নবাবের গোলন্দাজদের কিছুমাত্র ক্ষতি হয়নি। তারা অক্ষতদেহে বিপুলবিক্রমে ইংরেজ সেনার উপর মিনিটে মিনিটে গোলা বর্ষণ করতে লাগল। আধ ঘণ্টাতেই ক্লাইভের সমরসাধ মিটল। তিনি বুঝতে পারলেন প্রতি মিনিটে একজন করে নিহত ও কয়েক জন আহত হতে থাকলে, তার তিন হাজার সৈন্য বেশি সময় শৌর্যবীর্য প্রকাশ করার সুযোগ পাবে না। সুতরাং আত্মরক্ষার জন্য ক্লাইভকে সসৈন্য পিছু হটতে হলো।

ইংরেজ সেনার দু'টি কামান বাইরে থাকল, আর চারটি কামান নিয়ে তারা আম বাগানের মধ্যে লুকিয়ে গেল। ক্লাইভের আদেশে সকলেই গাছের আড়ালে বসে পড়ল। নবাবের তোপমঞ্চগুলি ৪ হাত উঁচু। সুতরাং মীরমদনের গোলা ইংরেজসেনার মাথার উপর দিয়ে ছুটতে লাগল। কখনও বা গাছের ডালে প্রতিহত হতে লাগল।

গাছের আড়ালে লুকিয়ে থেকেও ক্লাইভের আশঙ্কা দূর হলো না। নবাব-সেনার ব্যূহ রচনায় এবং সমরকৌশলে তার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠেছিল। তিনি উমিচাঁদকে ভর্ৎসনা করে বলতে লাগলেন–

'তোমাদের বিশ্বাস করে বড়ই কুকর্ম করেছি। তোমাদের সঙ্গে কথা ছিল, নাম মাত্র যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা হলেই মনের ইচ্ছে পূর্ণ হবে; সিরাজসেনা যুদ্ধক্ষেত্রে বাহুবল প্রদর্শন করবে না। এখন যে তার সকল কথাই বিপরীত হচ্ছে।'

উমিচাঁদ বিনীতভাবে নিবেদন করলেন–

'যারা যুদ্ধ করছে, তারা মীরমর্দন এবং মোহনলালের সেনাদল; তারাই কেবল প্রভুভক্ত। তাদের কোনো রকমে পরাজিত করতে পারলেই হয়। অন্যান্য সেনানায়ক কেউ অস্ত্র চালনা করবেন না।'

মীরমর্দন ধীরে ধীরে সামনে অগ্রসর হয়ে বিপুলবিক্রমে গোলা চালনা করতে লাগলেন। সে সময় মীর জাফরের চক্রব্যূহ যদি আর একটু অগ্রসর হয়ে কামানে অগ্নিসংযোগ করতো, তাহলে আর রক্ষা ছিল না। কিন্তু মীর জাফর, ইয়ার লতিফ, রায়দুর্লভ যেখানে সেনাসমাবেশ করেছিলেন, সেখানেই পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রণকৌতুক দেখতে লাগলেন। বেলা ১১টার সময় গলদঘর্ম কলেবরে ক্লাইভ সমরসভার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করতে বসলেন। স্থির হলো, সারাদিন আম বাগানে লুকিয়ে কোনোরূপে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে হবে। পলাশী বিজেতা ক্লাইভ যে এইরূপে প্রাণরক্ষা করেই সমর জয় করবেন, সে কথা তিনি নিজেই প্রকাশ করে গেছেন।

কামানের গোলার ধোয়ায় আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিল, তার ওপর আবার আষাঢ়ের নবমেঘে দুপুরেই পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে উঠল। ঠিক দুপুরে বৃষ্টি শুরু হলো। মীরমর্দনের অনেক বারুদ ভিজে গেল। তার কামানগুলি শিথিল হয়ে পড়ল। কেননা মীর মর্দনের কামানগুলির ওপর কোনো ঢাকনা ছিল না। তিনি পুনরায় বিপুল-বিক্রমে শত্রুদলকে আক্রমণ করছেন, এমন সময় ইংরেজদের একটি গোলা এসে তাঁর উরুস্থল ছিন্ন করে ফেলে।

বাঙালি সেনাপতি মীরমর্দন বীরের মতো শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়ে দৈববিড়ম্বনায় ভীষণ আঘাতপ্রাপ্ত হলেন। মোহনলাল যুদ্ধ করতে লাগলেন, মীরমদনকে সকলে ধরাধরি করে সিরাজউদ্দৌলার সামনে নিয়ে আসলেন। তিনি বেশি কিছু বলার অবসর পেলেন না, শুধু বললেন–

'শত্রুসেনা আম বাগানে পালিয়েছে। তবু নবাবের প্রধান সেনাপতিরা কেউ যুদ্ধ

www.nagorikpathagar.org

করছেন না। সসৈন্য পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছেন।'

মীরমর্দনের বীরবাহু চিরদিনের মতো অবসন্ন হলো। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে সিরাজের বল-ভরসা আচমকা তিরোহিত হয়ে গেল।

সিরাজ নিরূপায় হয়ে আর একবার মীর জাফরকে উত্তেজিত করার জন্য তাঁকে ডেকে পাঠালেন। মীর জাফর অনেক ইতস্তত করে, অনেক কালহরণ করে, অবশেষে প্রিয়পুত্র মিরন এবং পাত্র-মিত্রদের সাথে দলবদ্ধ হয়ে সিরাজের পটমন্ডপে প্রবেশ করলেন। মীর জাফর ভেবেছিলেন, সিরাজউদ্দৌলা হয়তো তাঁকে বন্দী করে ফেলবেন। কিন্তু পটমণ্ডপে প্রবেশ করা মাত্র সিরাজ তাঁর সামনে রাজমুকুট রেখে দিয়ে ব্যাকুল হৃদয়ে বলে উঠলেন–

'যা হবার তা হয়েছে। তুমি ছাড়া রাজমুকুট রক্ষা করে এমন আর কেউ নেই। মাতামহ জীবিত নেই। তুমিই এখন তাঁর স্থান পূর্ণ কর। মীর জাফর! আলিবর্দীর পুণ্যনাম স্মরণ করে দেশের মান-সম্মান এবং আমার জীবন রক্ষায় সহায়তা কর।'

মীর জাফর সসম্ভ্রমে যথারীতি রাজমুকুটকে কুর্নিশ করে, বুকের উপর হাত রেখে, বিশ্বস্তভাবে বলতে লাগলেন–

'অবশ্যই শত্রু জয় করব। কিন্তু আজ দিবা অবসান প্রায় হয়েছে, সিপাহিরা প্রভাত হতে রণশ্রমে অবসন্ন হয়ে পড়েছে; আজ সেনাদল শিবিরে প্রত্যাগমন করুক; প্রভাতে আবার যুদ্ধ করলেই হবে।'

সিরাজ বললেন–

'নিশারণে ইংরেজ সেনা শিবিরে আক্রমণ করলেই যে সর্বনাশ হবে!'

মীর জাফর সগর্বে বলে উঠলেন–

'আমরা রয়েছি কেন?'

সিরাজের মতিভ্রম হলো। তিনি মীর জাফরের মৌখিক উত্তেজনায় আত্মবিস্মৃত হয়ে, সেনাদলকে শিবিরে প্রত্যাগমন করবার জন্য আদেশ প্রদান করতে বাধ্য হলেন। মহারাজ মোহনলাল তখন বিপুল বিক্রমে শত্রুসেনার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তিনি সসম্ভ্রমে বলে পাঠালেন–

'আর দুই চারি দন্ডের মধ্যেই যুদ্ধ শেষ হবে, এখন কি শিবিরে প্রত্যাবর্তন করবার সময়? পদমাত্র পশ্চাদগামী হলে, সিপাহিদল ছত্রভঙ্গ হয়ে সর্বনাশ হবে–

ফিরব না, যুদ্ধ করব ।'

এ সংবাদে মীর জাফর শিউরে উঠলেন । তিনি বিবিধ অজুহাতে সিরাজউদ্দৌলার মনস্তুষ্টি করে পুনরায় সংবাদ পাঠালেন–

'ক্ষান্ত হও, শিবিরে প্রত্যাগমন কর ।'

রোষে ক্ষোভে মোহনলালের নয়নযুগল হতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হতে লাগল । কিন্তু তিনি আর কি করবেন? তিনি একজন মনসবদার মাত্র, সমরক্ষেত্রে সেনাপতির আদেশ লঙ্ঘন করতে পারলেন না । যথাসম্ভব শ্রেণীবদ্ধ হয়ে ধীরে ধীরে শিবিরের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন । মীর জাফরের মনস্কামনা পূর্ণ হলো । তিনি তৎক্ষণাৎ ক্লাইভকে লিখে পাঠালেন,

'মীরমর্দন গতায়ু হয়েছেন, আর লুকিয়ে থাকা নিষ্প্রয়োজন । ইচ্ছা হয় এখনই রাত্রি ৩ ঘটিকার সময় শিবির আক্রমণ করবেন, তাহলে সহজেই কার্যসিদ্ধি হবে ।'

মোহনলালকে শিবিরে প্রত্যাগমন করতে দেখে, ইংরেজসেনা আম্রবন হতে বের হতে লাগল । ক্লাইভ এই সময়ে মৃগয়ামঞ্চের কক্ষমধ্যে পদচারণা করছিলেন । কেউ কেউ বলেন, তিনি সে সময়ে নিরাপদে নিদ্রামগ্ন হয়েছিলেন । মেজর কিলপ্যাট্রিক আম্রবনে সেনাচালনা করছিলেন । ইংরেজসেনা পুনরায় উন্মুক্ত প্রান্তরে সমবেত হয়েছে, এই সংবাদে ক্লাইভ দ্রুতপদে সেনাদলে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর অনুমতি না নিয়েই কিলপ্যাট্রিক এরূপ অসম সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন বলে, সেই অপরাধে তাঁকে বেঁধে ফেললেন । পরে আত্মভ্রম বুঝতে পেরে, স্বয়ং সেনাচালনার ভার গ্রহণ করে মেজর সাহেবের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করত ক্রমশ সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগলেন । এতদ্দর্শনে অনেকেই পলায়ন করতে লাগল । কিন্তু ফরাসি বীর সিনফ্রে এবং বাঙালি বীর মোহনলাল ফিরে দাঁড়ালেন; তাঁদের সেনাদল হটল না । যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ, তারা অকুতোভয়ে অমিতবিক্রমে প্রাণপনে যুদ্ধ করতে লাগল ।

এদিকে কতকগুলি সিপাহী সেনাদেরকে ইতস্তত পলায়ন করতে দেখে সুচতুর রায়দুর্লভ সিরাজউদ্দৌলাকেও পলায়ন করবার জন্য প্ররোচিত করতে লাগলেন । কিন্তু সিরাজ সহসা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিত্যাগ করলেন না । মুসলমান ইতিহাস লেখকগণ বলেন যে, যখন দিবা অবসানপ্রায়, তখন সিরাজউদ্দৌলা দেখলেন যে, বিপুল সেনাপ্রবাহের মধ্যে অল্প লোকেই তাঁর জন্য যুদ্ধ করছে, এরূপ অবস্থায় তাঁর মনে হলো, পলাশীতে পরাজিত না হয়ে, রাজধানী রক্ষার জন্য মুর্শিদাবাদে

গমন করাই বুদ্ধিমানের কাজ। রাজবল্লভও সেই মত পোষণ করলেন। সুতরাং সিরাজউদ্দৌলা আর ইতস্তত না করে দুই সহস্র অশ্বারোহী সমভিব্যহারে গজারোহণে যুদ্ধ ভূমি হতে প্রস্থান করলেন।

মীর জাফর সময় পেয়ে ইংরেজদলে যোগদান করবার জন্য অগ্রসর হতে লাগলেন। ইংরেজরা কিন্তু শত্রু মিত্র চিনতে না পেরে তাঁর ওপরও গোলাবর্ষণ করতে ক্রটি করলেন না। অপরাহ্ন ৫ ঘটিকা পর্যন্ত অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করতে করতে মোহনলাল এবং সিনফ্রে বিশ্বাসঘাতক নবাব সেনানায়কদের উপর বিরক্ত হয়ে সমরক্ষেত্র পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। নবাবের পরিত্যক্ত জনশূন্য পটমন্ডপের দিকে ইংরেজসেনা মহাদম্ভে অগ্রসর হয়ে, পলাশী–যুদ্ধের শেষ চিত্রপট উদঘাটন করল। সেনাপতিদের বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে এভাবে প্রায় বিনাযুদ্ধে পলাশী প্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল।

পলাশী যুদ্ধ প্রকৃত অর্থে কোন যুদ্ধই ছিল না। এটি ছিল বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার স্বাধীনতা বিরোধীদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের কলংকজনক অধ্যায়। সেই চক্রান্তকারীরা ছিলেন জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ এবং ব্রিটিশ বেনিয়া ও অর্বাচীন মীর জাফর আলী খান। এটি যুদ্ধ ছিল না বটে, তবে পরিণাম বড়ই উজ্জ্বল বিবেচনায় পলাশীর যুদ্ধ এখন বৃটিশবাহিনীর মহাযুদ্ধের মধ্যে পরিগণিত হয়েছে। কিন্তু যেরূপে পলাশীক্ষেত্রে সিরাজসেনার পরাজয় হয়েছিল, তাতে একে প্রকৃত সমর বলে বর্ণনা করা যায় না। সিরাজসেনা যেরূপভাবে ব্যূহ রচনা করেছিল, সেইরূপভাবে সমরক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে থাকলেও পরাজিত করা সম্ভব হত না। তারা আম্রবনে বেষ্টন করে বীরের ন্যায় যুদ্ধ করলে তো কথাই ছিল না। রাজবিদ্রোহীদের কমন্ত্রণায় সিরাজউদ্দৌলা সমরক্ষেত্র পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলে, রাজবিদ্রোহীদলের চক্রান্তে সিরাজসেনা তাদের অধিকৃত ভূমি হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে, শূন্যক্ষেত্রের ওপর দিয়ে ইংরেজরা সদর্পে অগ্রসর হবার সুযোগ লাভ করলো। এই অবস্থার আলোচনা করে জনৈক ইংরেজ ঐতিহাসিক ম্যালিসন বলে গেছেন–

'একে প্রকৃত যুদ্ধ বলে বর্ণনা করা যায় না।'

পলাশীর যুদ্ধভূমি ভাগীরথী–গর্ভে বিলীন হয়েছে। যুদ্ধভূমির নিকট দিয়ে যে রেলপথ নির্মিত হয়েছে, তার একটি স্টেশনের নাম 'পলাশী'। তা যুদ্ধক্ষেত্র নয়। লর্ড কার্জন সমগ্র নদীয়া জেলাকে পলাশী জেলা বলে নতুন নামে পরিচিত করে স্মৃতিরক্ষার কল্পনা করেছিলেন; সে কল্পনা কার্যে পরিণত হয়নি। লক্ষবাগের শেষ আম্রবৃক্ষটি সমূলে উৎখাত হয়ে বিলেতে চালান হয়েছে। পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রের

www.nagorikpathagar.org

স্থাননির্দেশের জন্য একটি আধুনিক স্মৃতিস্তম্ভে লিখিত আছে– 'Battle Field of Plassey, June 23rd , 1757.' এটি একটি জয়সূচক স্মৃতিস্তম্ভ। এটি ইংরেজদের নির্মিত। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়ের মতে ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজরা এটি নির্মাণ করে। ইংরেজদের দ্বারা এ ধরণের একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হতেই পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে ভারতবাসীর ভূমিকা কি হওয়া উচিৎ ছিল? ইংজেদের জয়স্তম্ভকে গুঁড়িয়ে দিয়ে সেখানে স্বাধীনতা হারানোর একটি বেদনার স্মারক কি ভারতবাসী নির্মাণ করে তার অতীত দায় খানিকটা মোছনের চেষ্টা করতে পারত না? অন্তত ভারতবর্ষ হতে ইংরেজদেরকে বিতাড়নের পরও তো দেশপ্রেমিক ভারতবাসী কুখ্যাত এ স্মৃতিস্তম্ভটি মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে পারত!

পলাশীর প্রান্তরে বর্ণিত ফলকলিপি ছাড়াও আরো কতিপয় নিদর্শন বিদ্যমান আছে যেগুলোর অন্যতম হচ্ছে একজন মুসলমান জমিদারের সমাধিস্থল। এই মুসলমান বীর সম্মুখ-সংগ্রামে সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসন রক্ষার জন্য প্রাণপণে অস্ত্রচালনা করে অবশেষে চিরনিদ্রায় শায়িত হয়েছেন। প্রতি বৃহস্পতিবার বাঙালি কৃষাণ–কৃষাণীরা ভক্তিভরে মহান এ মুক্তিযোদ্ধা দরবেশের মাজারে এখনও সমবেত হন এবং মহান আল্লাহর করুণা ভিক্ষা করেন।

পলাশীর প্রান্তরে যুদ্ধ নামক প্রহসনে হতবিহ্বল দেশপ্রেমিক নবাব সিরাজউদ্দৌলা দেশ মাতৃকার স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের মানসে পলাশী হতে প্রস্থান করে ২৪ শে জুন শুক্রবার সকালে মনসুরগঞ্জের হিরাঝিল প্রাসাদে ফিরে আসেন। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তিনি পাত্র-মিত্রগণকে বারংবার আহ্বান করতে লাগলেন। কিন্তু কেউ তাতে কর্ণপাত করল না, এমনকি তার শ্বশুর মোহাম্মদ ইরিচ খাঁও না। সিরাজউদ্দৌলা রাজকোষ উন্মুক্ত করে দিলেন

'যার যত ইচ্ছা অর্থ নাও কিন্তু দেশকে পরাধীন হতে দিও না।'

লোভী তষ্করেরা রাজকোষ থেকে অর্থ নিল বটে কিন্তু দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় কেউ এগিয়ে এল না। অবস্থা বেগতিক দেখে নবাব স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে অন্যত্র সরে গিয়ে পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করে যুদ্ধ করার সংকল্প পোষণ করেন।

ঐতিহাসিক মুতাক্ষরীণ সিরাজের পশ্চাৎগমন প্রসঙ্গে লিখে গেছেন,

'স্থলপথে পলায়ন করলেই ভাল হত। অর্থলোভেই হোক আর স্নেহবশতই হোক, অনেকে তাঁর অনুগমন করতে পারতো এবং বহুজনবেষ্টিত সিরাজউদ্দৌলাকে কেউ সহজে কারারুদ্ধ করতে পারতো না।'

কিন্তু সিরাজ কি উদ্দেশ্যে একাকী নৌকায় আরোহণ করে পশ্চাৎগমন করেছিলেন

www.nagorikpathagar.org

তার রহস্য-উদঘাটন করা কঠিন। কেবল প্রাণরক্ষার জন্য পলায়ন করা আবশ্যক হলে, ভগবানগোলা হতে পদ্মাস্রোতে পূর্বাভিমুখে তরণী ভাসিয়ে দিলেই অনায়াসে দূরাঞ্চলে উপনীত হওয়া যেত। সিরাউদ্দৌলা যে নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে, কেবল স্বাধীনতা রক্ষার জন্যেই জনশূন্য রাজধানী হতে পলায়ন করেছিলেন, তাঁর পলায়ন প্রণালীই তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। কোনোরূপে পশ্চিমাঞ্চলে পলায়ন করে মঁসিয়ে লা সাহেবের সেনা সহায়তায় পাটনা পর্যন্ত গমন করা ও সেখানে বিহারের শাসনকর্তা রামনারায়নের সেনাবল নিয়ে স্বাধীনতা রক্ষার আয়োজন করাই সিরাউদ্দৌলার উদ্দেশ্য ছিল। তাই তিনি মহানন্দার ভেতর দিয়ে গোপনপথে দীনদরিদ্রের ন্যায় পাটনার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন।

রাজমহলের নিকট কালিন্দী নাম্নী জাহ্নবীর ক্ষুদ্র শাখা নিঃসৃত হয়ে, পুরাতন গৌড় জনপদের উত্তরাংশে গিয়ে মালদহের নিকট মহানন্দার সাথে মিলিত হয়েছে। নাজিরপুরের নিকট এর মোহনা ছিল; এখনো সেখানে তার চিহ্ন রয়েছে। এই পথ নিরাপদ মনে করে, সিরাউদ্দৌলা নিঃশঙ্কচিত্তে অগ্রসর হতে লাগলেন।

সিরাউদ্দৌলা আর সামান্য একটু বিলম্ব করলে রাজধানীতেই কারারুদ্ধ হতেন। তিনি যে প্রভাতে মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগমন করেন, সেই প্রভাতে মীর জাফর এবং মীরণের সঙ্গে দাদপুরের বৃটিশ শিবিরে পলাশী বিজয়ী কর্নেল ক্লাইভের শুভদর্শন হয়। চতুর ক্লাইভ মীর জাফরকে অবিলম্বে মুর্শিদাবাদে উপনীত হয়ে সিরাউদ্দৌলাকে কারারুদ্ধ করে রাজকোষ হস্তগত করবার উপদেশ দান করেন।

মীর জাফর রাজধানীতে আসা মাত্র শুনতে পেলেন যে, শিকার হাত ছাড়া হয়ে গেছে। তিনি আর কি করবেন? অবিলম্বে হিরাঝিলের শূন্য রাজসিংহাসন অধিকার করে, সিংহাসনাধিপতি সিরাজউদ্দৌলাকে কারারুদ্ধ করবার জন্য চারদিকে লোক লস্কর প্রেরণ করতে আরম্ভ করলেন।

মীর জাফরের সহোদর মীর দাউদ রাজমহলের ফৌজদার ছিলেন। মীর কাশিম তাঁর অধীনে সেনা চালনা করতেন। মীর কাশিম এবং মীর দাউদের ওপর সিরাজউদ্দৌলার পশ্চাদ্ধাবনের আদেশ হওয়ামাত্র তাঁরা মুর্শিদাবাদ হতে রাজমহল পর্যন্ত সমস্ত গ্রাম নগর তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করতে আরম্ভ করলেন। অন্দরমহলের রমণীগণ কারারুদ্ধ হলেন; সিরাজের কনিষ্ঠ সহোদর মির্জা মেহেদী আলী, মহারাজ মোহনলাল কারারুদ্ধ হলেন; কিন্তু তখন পর্যন্ত সিরাউদ্দৌলার কোনোরূপ সন্ধান মিলল না।

এদিকে ক্লাইভ ২৯ শে জুন ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রায় ২০০ গোরা ও ৫০০ কালা সিপাহী নিয়ে মনসুরগঞ্জে প্রবেশ করেন। এই দিনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ক্লাইভ লিখে গেছেন–

> 'সেদিন যত লোক রাজপথ পার্শ্বে সমবেত হয়েছিল, তারা ইংরেজ নিধনে কৃতসংকল্প হলে, কেবল লাঠি সোটা এবং ইস্টক নিক্ষেপেই তৎকার্য সাধন করতে পারত'।

যাই হোক সেই ক্লাইভের হাত ধরে হিন্দু জমিদার ও রাজকর্মচারীদের তুষ্ট করে মীর জাফর আলী খান বাংলা বিহার উড়িষ্যার সিংহাসনে সমাসীন হলেন।

www.nagorikpathagar.org

সিরাজের বন্দী ও শাহাদাতবরণ

যুদ্ধের অবস্থা বুঝেই সিরাজউদ্দৌলা ফরাসী সেনাপতি মঁসিয়েলকে রাজমহলের পথে মুর্শিদাবাদে উপনীত হবার জন্য সংবাদ পাঠিয়েছিলেন। রাজা রামনারায়ণ অর্থাদি প্রদান করতে বিলম্ব করায়, মঁসিয়েলা সংবাদ পাওয়ামাত্র যুদ্ধযাত্রা করতে পারেননি। তিনি যখন সসৈন্যে ভাগলপুরের নিকটবর্তী হলেন, সিরাজউদ্দৌলা তখন মহনন্দা-স্রোত অতিক্রম করছেন। তার নৌকা যখন বখরা বরহাল নামক পুরাতন পল্লীর নিকটবর্তী হলো, তখন সহসা তাঁর গতিরোধ হলো। নাজিরপুরের মোহনা অতিক্রম করতে পারলেই বড় গঙ্গায় প্রবেশ করা যেত, কিন্তু জলাভাবে নাজিরপুরের মোহনা শুষ্কপ্রায়; আর নৌকা চলল না।

এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় সিরাজউদ্দৌলার সর্বনাশের সূত্রপাত হলো। তিনি ভেবেছিলেন যে, তাঁর পরাজয়বার্তা তখন পর্যন্তও দূর-দূরান্তে পৌঁছায়নি। সেই ভরসায় সিরাজউদ্দৌলা স্বয়ং নদীতীরে অবতরণ করলেন; নাবিকগণ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে নদীমুখের সন্ধান নিতে লাগল। ইত্যবসরে সামান্য খাদ্য সংগ্রহের জন্য সিরাজ নিকটস্থ একটি মসজিদে গমন করলেন। এই মসজিদ দানশাহ নামক এক মুসলমান সাধুর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হত। মসজিদটি এখন পর্যন্ত সাহপুর নামক গ্রামে ভগ্নাবস্থায় বিরাজ করছে। ক্ষুদ্র পল্লীতে সিরাজউদ্দৌলার ন্যায় অতিথির নৌকা দেখে লোকেরা বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছিল, পরে নাবিকগণের নিকট সন্ধান নিয়ে তারা সকল সমাচার অবগত হলো। মীর দাউদ এবং মীর কাশিমের সেনাদল সিরাজের খোঁজে নিকটেই অবস্থান করছিলেন। অর্থলোভে লোকে তাদেরকে সিরাজউদ্দৌলার সন্ধান বলে দিল। সিরাজ ক্ষুধার অন্ন গলাধঃকরণ করবারও অবসর পেলেন না, সপরিবারে মীর কাশিমের হাতে বন্দী হলেন।

মীর কাসিম যখন সিরাজউদ্দৌলাকে কারারুদ্ধ করেন, সিরাজ তখন নিরস্ত্র, নিঃসঙ্গ। তিনি অনন্যোপায় হয়ে অর্থ বিনিময়ে স্বাধীনতারক্ষা করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেও কৃতকার্য হতে পারলেন না। মীর কাশিমও অর্থলোভ পরিত্যাগ করতে পারলেন না। তিনি লুৎফুন্নেসা বেগমের বহুমূল্য রত্নালঙ্কারগুলি আত্মসাৎ করলেন। মঁসিয়া লা এই সময়ে ত্রিশ মাইল মাত্র দূরে ছিলেন। তিনি সিরাজের সাথে মিলিত হবার পূর্বেই সিরাজের স্বাধীনতা রক্ষার সকল আশা

নির্মূল হয়ে গলে।

মীর দাউদ মহোল্লাসে এই সংবাদ মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করা মাত্র মীর জাফরের প্রবল উৎকণ্ঠা দূর হয়ে গেল। তিনি ক্লাইভের কণ্ঠলগ্ন হয়ে হীরাঝিলে মন্ত্রনা করেছিলেন, সংবাদ পাওয়া মাত্র সিরাজউদ্দৌলাকে বেঁধে আনবার জন্য মীর জাফর-পুত্র মীরনকে সসৈন্য পাঠিয়ে দিলেন।

আত্মভৃত্যবর্গের নিষ্ঠুর নির্যাতনে জীবন্মৃত অবস্থায় সিরাজউদ্দৌলা বন্দীবেশে মুর্শিদাবাদে উপনীত হলেন। আলীবর্দীর অতি আদরের নাতির এই ভাগ্যপরিবর্তনের চিত্র সম্মুখে দেখে মুর্শিদাবাদের লোক হাহাকার করে উঠল। সিরাজউদ্দৌলার সুকুমার দেহকান্তি আত্মভৃত্যবর্গের নিষ্ঠুর নির্যাতনে মলিন হয়ে উঠেছিল। তাঁকে দেখামাত্র নাগরিকদের সহানুভূতি উদ্বেলিত হয়ে উঠল। মীল জাফরের সেনাদল কৃতঘ্নের ন্যায় সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসন কেড়ে নিয়ে তাঁর যে দুর্গতি করেছে, তা তারাও বুঝতে পারল। তারা দেখল যে, তাদের মহাপাপে রাজাধিরাজ বন্দী হলেন, কৃতঘ্ন রাজকর্মচারি শূন্য সিংহাসনে উপবেশন করলেন, তাঁর গুপ্ত সংকল্পের প্রধান সহচরগণ মহোল্লাসে রাজকোষের ধনরত্ন কোলকাতায় চালান করে দিলেন, অথচ মীর জাফরের সেনাদল রাজকোষে অর্থাভাব বলে তাদের বেতন এ পর্যন্তও প্রাপ্ত হলো না। তখন তারা অধীর হৃদয়ে ওষ্ঠ দংশন করতে লাগল, কেউ কেউ সিরাজউদ্দৌলার মুক্তিলাভের সদুপায় চিন্তা করবার জন্য রাজপথে সমবেত হতে লাগল, মুর্শিদাবাদ টলমল করে উঠল।

এদিকে সিরাজকে বন্দী করে আনা হলো তার সাধের মুর্শিদাবাদের রাজমহলে, যেখান থেকে বহুবার তিনি হুংকার দিয়েছেন বিদেশী ইংরেজ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে। কিন্তু স্বাধীনতাকামী দেশপ্রেমিকের কি নিদারুণ পরিণাম? মীর জাফর–ক্লাইভের নির্দেশে তাকে রাজমহল থেকে এনে জাফরাগঞ্জ প্রাসাদের (মীর জাফরের প্রসাদ যা বর্তমানে নিমকহারাম দেউড়ী নামে পরিচিত) একটা ছোট কুঠরীতে আটক করা হলো। পরদিন গভীর রাতে এগিয়ে এলো ঘাতক মোহাম্মদী বেগ। মীর জাফরের পুত্র মীরণের নির্দেশে সিরাজের পিতা–মাতার অতি আদরে পালিত মোহাম্মদী বেগের তরবারির নিষ্ঠুর আঘাতে নিহত হলেন বাংলা–বিহার–উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা। হত্যার সময় ঘাতকের অট্টহাসিতে কেঁপে উঠেছিল জাফরাগঞ্জ প্রাসাদ, কেঁপে উঠেছিল মুর্শিদাবাদ। সেদিন বাংলার স্বাধীনচেতা দেশপ্রেমিক নবাব ঘাতকের কাছে প্রাণভিক্ষা চেয়ে বাংলাকে, বাংলার জনগণকে অপমাণিত করেননি। তিনি শুধু চেয়েছিলেন দু'রাকায়াত নামাজ পড়ার সময়। কিন্তু সে সময়টুকুও তাকে দেওয়া

www.nagorikpathagar.org

হয়নি। অত্যন্ত নির্মমভাবে তাকে হত্যা করা হলো। সেদিন ছিল ৩ জুলাই, ১৭৫৭ সাল।

ইতিহাসের নিরিখে দেখা যায় যে সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করার পিছনে বহু পূর্ব থেকেই জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ, নন্দকুমার প্রমুখ হিন্দু রাজকর্মচারিগণ সক্রিয় ছিলেন এবং তারা কেউই মীর জাফরের চেয়ে কোনো অংশেই কম বিশ্বাসঘাতক ছিলেন না। পলাশীর প্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হবার জন্য মীর জাফরের মতো এরা সবাই সমভাবে দায়ী।

www.nagorikpathagar.org

সিরাজউদ্দৌলার দাফন

সিরাজের রূপ লাবন্যময় দেহ উপর্যুপরি তরবারির আঘাতে ক্ষত বিক্ষত করে ফেলেছিল মোহাম্মদী বেগ। পরদিন অর্থাৎ ৪ জুলাই ১৭৫৭ তারিখে সেই ছিন্নভিন্ন দেহ হাতীর পিঠে চাপিয়ে বের করা হলো আনন্দ মিছিল। নেতৃত্বে মীর জাফরের পুত্র মীরণ। চললো রাজপথ পরিভ্রমণ। সেই ভয়ংকর মিছিল দেখে মুর্শিদাবাদের মানুষ শোকে বিস্ময়ে হাহাকার করে উঠল। তাদের আকুল আর্তনাদ নবাবের বেগম মহলে সিরাজ-জননী আমিনা বেগমের কর্ণগোচর হয়। তিনি পুত্রশোকে আত্মবিস্মৃত হয়ে অবগুণ্ঠন উন্মোচন -পূর্বক রাজপথ অভিমুখে ধাবিত হলেন। যার মুখমন্ডল দর্শন ছিল যেকোনো লোকের জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার, আজ তিনি পুত্রের শোচনীয় পরিণতির সংবাদে উন্মুক্ত রাজপথে সুমপস্থিত। কথিত আছে এই সময় শববাহী হাতী চালকের নির্দেশ অমান্য করে সহসা রাজপথে বসে পড়লো। হাতীর পৃষ্ঠ হতে পুত্রের মৃতদেহ নামিয়ে তিনি তা পুনঃ পুনঃ চুম্বন করতে লাগলেন এবং বুকে জড়িয়ে ধরে মাটিতে শুয়ে পড়লেন। নিঠুর মীরণের নির্দেশে তার অভদ্র দ্বাররক্ষীগণ চড়-কিল-ঘুষি মেরে নবাবের কন্যা ও স্ত্রী এবং সন্তানের মৃতদেহ বক্ষে ধারণে করা মা আমিনা বেগমকে জোর করে অন্দর মহলে পাঠিয়ে দিল।

তারপর মীরণের অনুচরবৃন্দ সিরাজের দলিত মথিত লাশ কবর দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা না করে বাজারের আবর্জনা-স্তুপের মধ্যে ফেলে দিয়ে চলে গেল। সারাদিন সিরাজের লাশ পড়ে রইল মুর্শিদাবাদের বাজারে সেই আবর্জনা স্তূপের মধ্যে। নবাবের মৃতদেহের উপর একটা সামান্য কাপড়ের আচ্ছাদান দেওয়ারও কেউ প্রয়োজন অনুভব করলো না। ভয়ে কেউ লাশের কাছে আসছিল না। এই সময় 'মীর্জা জয়নুল আবেদীন' নামের এক দয়ালু ওমরাহ মীর জাফরের কাছে আরজি জানালেন,

'আপনাদের যা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল তা তো সাধিত হয়েছে। এবার দয়া করে মৃতদেহটি দাফনের জন্য আমাকে অনুমতি দিন।'

সেদিন এই একটিমাত্র লোক 'মীর্জা জয়নুল আবেদীন' ছাড়া আর কেউ মীর জাফর, জগৎশেঠ, মীরণ ও ক্লাইভের বিরাগভাজন হওয়ার ভয়ে এগিয়ে আসেননি।

www.nagorikpathagar.org

তারপর সন্ধ্যার অন্ধকারে ভাগীরথীর পানি যখন রূপার পাতের মতো বয়ে যাচ্ছে, আতংকিত মানুষ যখন নিজ নিজ গৃহমাঝে আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছে, সবাই যখন কাটাতে চাইছে শোক ও বিস্ময়ের ঘোর, সেই সময়' মীর্জা জয়নুল আবেদীন' নামের এই দয়ালু মানুষটি অত্যন্ত যত্ন ও সম্মানের সাথে বুকে তুলে নিলেন হতভাগ্য নবাব সিরাজউদ্দৌলার ছিন্ন ভিন্ন মৃতদেহ। তারপর অতি তাজিমের সাথে লাশ ধুয়ে মুছে নৌকায় তুলে ভাগীরথী পাড়ি দিয়ে চললেন খোশবাগে। খোশবাগ ছিল নবাব আলীবর্দী খানের হাতে গড়া উদ্যান। এখানে ছিল নানা জাতের গোলাপের অপূর্ব সমারোহ। আলীবর্দী খাঁ তার জীবদ্দশায় নিজ সমাধির জন্য নির্মাণ করেছিলেন এই খোশবাগ। এখানেই নবাব আলীবর্দী খানের কবরের পাশে অত্যন্ত সযত্নে মাটির শয়ানে চির দিনের জন্যে শুইয়ে দেয়া হ'ল বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব খাঁটি বাঙ্গালী সিরাজউদ্দৌলাকে। সেদিন অন্তিম সুরে কোনো বিউগল বাজেনি। কামানবাহী শকটে করে লাশ নেয়া হয়নি, হয়নি কোনো শোক মিছিল, হয় নি ৩১ বার তোপধ্বনি। অতি সাধারণভাবে লোকচক্ষুর আড়ালে মীর্জা জয়নুল আবেদীন নামের একজন খাঁটি মানুষ অন্তিম শয়ানে শুইয়ে দিলেন বাংলা বিহার উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার লাশ। বাংলার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডীকে বুকে নিয়ে সেই থেকে খোশবাগ নীরব-নিথর নিস্তব্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই সীমাহীন মৌনতার মধ্যেই বোধ হয় সিরাজ আজও বেঁচে আছেন।

আলীবর্দী খানের মাতার কবরও এই খোশবাগে অবস্থিত। পরবর্তীকালে এই খোশবাগে দাফন করা হয় সিরাজের ছোট ভাই মীর্জা মেহেদীকে, সিরাজ-পত্নী বেগম লূৎফুন্নেসাসহ সিরাজ কন্যা উম্মে জহুরা, মোহনলালের বোন আলেয়া বেগম, সিরাজের খালাত ভাই শওকত জং এবং আরো অনেককে।

www.nagorikpathagar.org

সিরাজদ্দৌলার মূল্যায়ন

ব্যক্তি সিরাজ ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক, চরিত্রবান, অসম সাহসী ও নির্ভেজাল। তার এক বছর ২ মাস ১৪ দিনের শাসনামলের একটি মুহূর্তও তিনি নিরূপদ্রবে কাটাতে পারেননি। দেশমাতৃকার বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত শত্রুদের দমনের কঠিন সংগ্রামে তাকে লিপ্ত থাকতে হয়েছে। এহেন ঝঞ্জা-বিক্ষুদ্ধ পরিস্থিতিতে তিনি প্রজা-হিত সাধনে সামন্যতম ত্রুটি করেন নি। তিনি যদি দেশের এবং মানুষের স্বার্থ সামান্য পরিমাণেও বিকিয়ে দিতে পারতেন তাহলে তিনিই থাকতেন বাংলা বিহার উড়িষ্যার আমৃত্যু নবাব, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন হত কণ্টকযুক্ত। কিন্তু সে পথে তিনি যাননি কিংবা সে পথে যাবার চিন্তাও করেননি। বরং হাসিমুখে জীবন দান করে তিনি দেখিয়ে গেছেন কিভাবে মাতৃভূমিকে ভালবাসতে হয়। ফলে সিরাজের চরম দুশমন ইংরেজরাও সিরাজ চরিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছেন।

ইংরেজদের দোসর সিরাজের প্রতিপক্ষীয় জনৈক ইংরেজ ঐতিহাসিক কর্নেল ম্যালেসন এর ভাষায় সিরাজের মূল্যায়ন শোনা যাক–

> 'Whatever may have been his faults, Siraj'd-daulah had neither betrayed his master nor sold his country. Nay more, no unbiased Englishman, sitting in judgement on the events which passed in the interval between the 9th February and the 23rd June, can deny that the name of Siraj'd-daulah stands higher in the scale or honor than does the name of Clive. He was the only one of the principal actors in that tragic drama who did not attempt to deceive!'

স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সিরাজউদ্দৌলা সাফল্য লাভ করেননি সত্য, কিন্তু তিনি দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেননি। তিনি প্রাণ দিয়েছেন, তবু দেশকে তুলে দেননি বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের হাতে। পলাশীর যুদ্ধের পূর্ববর্তী ঘটনাসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, সিরাজের নাম যে কোনো বিবেচনায় শুধু ক্লাইভ কেন, অন্যান্য যে কারো চাইতে অনেক উচ্চে অবস্থান করছে। পলাশীর বিয়োগান্তক নাটকের বিভিন্ন চরিত্রসমূহের মধ্যে সিরাজউদ্দৌলাই হচেছন একমাত্র ব্যক্তি যিনি কখনো প্রতারণার আশ্রয় নেননি। তাই তো সিরাজউদ্দৌলা

www.nagorikpathagar.org

এবং দেশপ্রেম শব্দ দুটি সমার্থক হয়ে একে অন্যের পরিপূরক হয়ে আছে। আজও শীতের রাতে সিরাজউদ্দৌলা যাত্রাপালা দেখার জন্যে গ্রামে-গঞ্জে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার ঢল নামে। যাত্রা পালায় সিরাজের করুণ পরিণতি দেখে হাজার হাজার দর্শক চোখ মুছতে মুছতে বাড়ি ফেরে। মানুষের মনের মণিকোঠায় অবস্থানরত একটি অমর নাম হচ্ছে সিরাজউদ্দৌলা।

www.nagorikpathagar.org

সাংবাদিক আব্দুল হাই শিকদার-এর সরেজমিন প্রতিবেদন

সাংবাদিক আবদুল হাই শিকদার এর সরেজমিন প্রতিবেদন থেকে জানা যায়–

'সিরাজের সমাধিস্থল খোশবাগ আজও বাংলার সাধারণ হিন্দু-মুসলমানদের নিকট পুণ্যভূমি। দূর-দূরান্ত থেকে আজও মানুষ ছুটে আসেন এই সমাধিস্থলে। প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আলিবর্দি খান আর নবাব সিরাজউদ্দৌলার কবরে মোমবাতি জ্বালিয়ে দেন দূর গ্রামের লোকেরা। অশিক্ষিত ধর্মপ্রাণ হিন্দু-মুসলমানের চোখে নবাব আলিবর্দি খান ও তাঁর প্রাণপ্রিয় নাতি নবাব সিরাজউদ্দৌলা দরবেশের সম্মানে সমাসিন। তারা মানত করে এই মাজারে দুধ, পায়েস, মাংস নিয়ে আসে। মাজারে এসে তারা হাউমাউ করে কাঁদে। আবেদন জানায় স্রষ্টার কাছে।'

আব্দুল হাই শিকদার খোশবাগের মালি জনাব নরেনের বরাত দিয়ে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন। নরেনের ভাষায়–

'একজন মানুষের কথা বলতে পারি। প্রতি বছর ২ জুলাই তিনি আসেন। ৩ জুলাই সারাদিন নবাব সিরাজউদ্দৌলার কবরের পাশে বসে কুরআন শরীফ পড়েন, নামাজ পড়েন। ৪ জুলাই তারিখ সকালে তিনি চলে যান। ভদ্রলোক কারো সাথে তেমন কথা বলেন না। খাবার, পানি, বাতি সব সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। বয়স্ক এই ভদ্রলোককে ১২ বছর ধরে দেখছি আমি। কোথা থেকে আসেন, কেউ জানে না।।'

জনাব আব্দুল হাই শিকদারের সরেজমিন প্রতিবেদন থেকে আরো জানা যায়– 'এই সমাধি এলাকার তত্ত্বাবধায়ক হচ্ছে আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া। তবে সমাধি এলাকায় সরকারী উদাসীনতা কিংবা কর্তৃপক্ষের অবহেলা ও অবজ্ঞার ছাপ সুস্পষ্ট। সমাধি ভবনের চারপাশ জঙ্গলাকীর্ণ। সেখানে সাপ-খোপের বাস। বাতির কোনো ব্যবস্থা নেই। জায়গাটা বিকেলেই অন্ধকার হয়ে যায়। এভাবেই চরম অবহেলা আর অবজ্ঞার মধ্যেই চিরনিদ্রায় গোলাপবাগে ঘুমিয়ে আছেন বাংলা বিহার উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাবগণ এবং তাদের আত্মীয় স্বজন। ভারত ভূখন্ড স্বাধীন হয়েছে ১৯৪৭ সালে। ভারত স্বাধীন হবার পরও সিরাজউদ্দৌলার যেভাবে মূল্যায়ন হবার কথা ছিল সেভাবে হয়নি।

পলাশীতে যদি স্বাধীনতা হারাতে না হত তাহলে আজ বাংলার ইতিহাস

www.nagorikpathagar.org

অন্যভাবে লিখিত হতো। বাংলা চিরকালের সুজলা, সুফলা, শস্য শ্যামল এক দেশ। এদেশের মাটি ছিল উর্বর, সেখানে সোনা ফলতো। পলাশীতে পরাস্ত না হলে দু'শ বছরের ঔপনিবেশিক শোষণ আর নির্যাতনে নিঃশেষ হয়ে আজ দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য আমাদের পরনির্ভরতার অপমান ও কষাঘাতে জর্জরিত থাকতে হতো না। পলাশীতে বিশ্বাসঘাতকতার কাছে সমর্পিত না হলে নতুন করে জাতিসত্তার পরিচয় নিয়ে আজকের হীনমন্য বিতর্কের জন্ম হত না। বিশ্বসভায় আজ আমরা মাথা উঁচু করেই থাকতে পারতাম। কি কারণে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়েও মাত্র তিনি হাজার সৈন্যের কাছে সেদিন বাঙালি পরাজিত হয়েছিল তার মূল্যায়ন আজ একান্ত প্রয়োজন। কেননা তা না হলে আজকে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের চ্যালেঞ্জকে আমরা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারব না। সেদিন স্বাধীনতার শত্রু স্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয়নি। আর তাই জাতির অলক্ষ্যে জাতির স্বাধীনতা হারিয়ে গিয়েছিল। স্বাধীনতা সম্পর্কে তদানীন্তন সমাজ ও বুদ্ধিজীবীগণ এতই উদাসীন ছিলেন যে, তারা দেশপ্রেমিক নবাবের মৃত্যুকে নিছক ক্ষমতার হাত বদল বলেই ভেবেছিল। নবাবের লাশকে মুর্শিদাবাদের রাস্তায় ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ানো হয়েছিল আর জনমনে তার প্রতি ঘৃণা এবং অশ্রদ্ধা সঞ্চারের চেষ্টা চলেছিল। অথচ দায়িত্বশীল কণ্ঠ বা কলম বা নেতৃত্ব তখন প্রকৃত সত্য জনতার কাছে এবং ইতিহাসের পাতায় তুলে ধরবার চেষ্টা করে নি, হয় নি পাল্টা কোন প্রতিবাদ।

বীর, বিচক্ষণ ও দেশপ্রেমিক নবাবের চরিত্র হননের জোর হঠকারিতা চলেছিল সেদিন। অথচ যে নবাব চরম বিপদের মুহূর্তে দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেননি এবং কারোর প্রতি শাস্তিমূলক কোন ব্যবস্থাও গ্রহণ করেননি, সেই মহান নবাবের মহানুভবতা ও উদারতাকে সম্মান বা মূল্যায়ন করবার উদ্যোগ খুব একটা চোখে পড়ে না। নবাবের মৃত্যুর পর স্ত্রী লুৎফুন্নেসার ব্যতিক্রমধর্মী জীবন, তাঁর প্রেম-নিষ্ঠাও নবাব চরিত্রের ও নবাব ব্যক্তিত্বের সবচাইতে বড় ঐশ্বর্য। চারদিকে শত্রু আর বিশ্বাসঘাতকের ভিড়ের মধ্যেও অসামান্য বিচক্ষণতা ও ধৈর্যের সাথে সেদিন নবাব সবাইকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছেন, স্বাধীনতার জন্যে লড়াইতে শপথ করিয়েছেন। সিরাজের হৃদয়ের এই বিশালতাকে বাঙালী জাতি যদি সত্যিকারভাবে সম্মান দেখাতে পারতো তাহলে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে জয়ী হতে বাঙালীকে সম্ভবত দু'শ/আড়াইশ বছর অপেক্ষা করতে হতো না। তরুণ নবাব ঘরে-বাইরে বিপুল শত্রু পরিবেষ্টনীর মধ্যে চমৎকার বিচক্ষণতার সাথে কাশিমবাজার কুঠির প্রথম ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রজ্ঞা ও সাহসিকতার যে নজির সেদিন তিনি দেখিয়েছেন সে জন্যে

www.nagorikpathagar.org

বাঙালী আজও তাকে শ্রদ্ধা করে। তাঁর চরিত্রে কোন কলঙ্ক ছিল না। এমন নবাবের জন্যে জাতির গর্ব করার মতো অনেক কিছুই রয়েছে। নবাব সিরাজ কোনো ষড়যন্ত্রের পথ ধরে ক্ষমতায় আসেননি। ষড়যন্ত্র আর হঠকারিতার মাধ্যমে ক্ষমতা ধরে থাকার চেষ্টাও করেননি, বরং স্বাধীনতার জন্যে শাহাদাত বরণ করে ইতিহাসের স্বর্ণশিখরে নিজের জায়গা করে নিয়েছেন।

www.nagorikpathagar.org

পলাশী যুদ্ধ : চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র আর ট্র্যাজেডির কালো ইতিহাস

ভারত বর্ষের ইতিহাসে চক্রান্ত ও ট্র্যাজেডির সবচেয়ে ভয়াবহ ঘটনা হল পলাশীর যুদ্ধ। পলাশীর প্রান্তরে যুদ্ধ যুদ্ধ নামক প্রহসনের মধ্য দিয়ে ইংরেজ বেনিয়ারা ভারতে মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে তাদের দেড়শ' বছরের বেশি সময়ের এবং হিন্দুরা তাদের প্রায় হাজার বছরের আজন্ম লালিত চক্রান্তের সফল বাস্তবায়ন করে। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর প্রান্তরে বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। স্বাধীনতার বিমূর্ত প্রতীক দেশপ্রেমিক মহামনীষী নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাকে তারা নির্মম ও নৃশংসভাবে খুন করে তাঁর পবিত্র দেহকে নিয়ে ইতিহাসের জঘন্যতম তামাশায় লিপ্ত হয়। দেশ ও মানবতার শত্রুরা নবাবের পবিত্র দেহকে চতুষ্পদ জন্তুর সাথে বেঁধে দিনভর মুর্শিদাবাদের রাজপথে টেনে হিঁচড়ে বেড়িয়েছিল। সবশেষে দেশপ্রেমিক নবাবের অসাড় দেহকে কেটে টুকরো টুকরো করে কুকুর-শৃগালের খাবার হিসেবে ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলেছিল।

বস্তুত, দেশ ও মানবতার ঐ শত্রুরা সেদিন বাংলা ও ভারতের স্বাধীনতা সূর্যকেই অতল অন্ধকারে ছুঁড়ে মেরেছিল। জুন মাস আমাদের ইতিহাসের সেই ট্র্যাজেডিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ইতিহাসের ভয়াবহ সেই ট্র্যাজেডি সত্যান্বেষী ঐতিহাসিক গোলাম আহমদ মোর্তজা তাঁর তুলির আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলেছেন এইভাবে–

দিল্লীর শেষ সম্রাট যেমন বাহাদুর শাহ তেমনি ভারতের প্রাণকেন্দ্র বঙ্গদেশের শেষ নবাব ছিলেন সিরাজ-উদ-দৌলাহ। ১৭৫৭ সালে ইংরেজ ও তাদের দালালদের চক্রান্তে তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। সে সাথে তাঁর জীবনে মহানুভবতা, বিচক্ষণতা, বীরত্ব ও মহত্ত্বকে ইচ্ছাকৃতভাবে ইতিহাসে বিকৃত করা হয়েছে। আর ভারতের মাটি রক্ষা করতে নিজের দেহের সমস্ত রক্তবিন্দু দিয়ে যিনি ভারতের মাটিকে রক্ত রঞ্জিত করলেন তাঁর ঐতিহাসিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য সামান্যতম চেষ্টার পরিবর্তে অসামান্য অপচেষ্টা করা হয়েছে। কিভাবে কেন তা করা হয়েছে, তাই আলোচনার প্রয়োজন।

www.nagorikpathagar.org

আগেই বলেছি বঙ্গদেশকে ভারতের মস্তিষ্ক বলা যেতে পারে। বাংলার সম্পদ-সম্পত্তি ও অর্থ ইংরেজদের হাত শক্ত করেছিল তাই ইংরেজদের পক্ষে ফরাসিদের পরাজিত করা সহজসাধ্য হয়েছিল।

সম্রাটদের রাজ্যে বঙ্গদেশ একটা প্রদেশ বলে গণ্য ছিল। মুর্শিদ কুলী খান ছিলেন বাংলার প্রথম নবাব। পরে ১৭২৭ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর জামাতা সুজাউদ্দিন বাংলা বিহারের নবাব হন। এরপর ১৭৩৯ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর পুত্র সরফরাজ খাঁ সিংহাসনে বসেন। তিনি খুব উপযুক্ত ও শক্তিশালী ছিলেন। তাঁর অধীনস্থ গভর্নর আলিবর্দী খাঁ মারাঠা ও বর্গীদের লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে প্রতিরোধ করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। এতে সরফরাজ খাঁ খুব একটা গুরুত্ব দেননি। ফলে বীর আলিবর্দীর বীরত্ব প্রকাশে বাধা সৃষ্টি হয় দেখে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং সরফরাজকে পরাজিত করে নিজে নবাব হন।

আলিবর্দী খাঁ উপযুক্ত শাসক ও বীর ছিলেন। মারাঠা, বর্গী প্রভৃতি জাতির লুণ্ঠন ও অত্যাচারকে তিনি কঠোর হস্তে দমন করেন। ইংরেজরা আলিবর্দীর হাবভাবে চরম নীতির পরিবর্তে নরম নীতি অবলম্বন করে এবং তাঁর দরবারে জানানো হয় যে, 'আমরা মহামতি আকবরের সময় থেকে আজ পর্যন্ত আপনাদের অর্থাৎ মুসলমানদের অনুগ্রহে ব্যবসা করছি এবং ঘাঁটিও নির্মাণ করে থাকি। অতএব আশা করি আপনি আমাদের এ দুটি সুযোগই পুনর্বহাল রাখবেন।

আলিবর্দী জানালেন ব্যবসা করার অনুমতি দেয়া হচ্ছে কিন্তু দুর্গ নির্মাণের কোন সুযোগই নেই। যদি পর্তুগিজদের আক্রমণের ভয় আছে বলে অজুহাত দর্শান তাহলে জেনে রাখবেন যে কোন বহিশক্রর জন্য নবাব আলিবর্দীই যথেষ্ট।

আলিবর্দী খানের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তাই তাঁর প্রাণপ্রিয় নাতি সিরাজ-উদ-দৌলাহ সিংহাসনে বসেছিলেন। সিরাজ এর পিতার নাম ছিল জয়নুদ্দিন আহমেদ। তিনি ছিলেন বিহারের গভর্নর। আর তাঁর মায়ের নাম ছিল আমিনা। এ সিরাজ-উদ-দৌলার রাজত্বকাল ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মিথ্যা দুর্নামে আসরে তাঁর ভূমিকা আধুনিক ইতিহাসে অতীব চিত্তাকর্ষক।

সিরাজের বিরুদ্ধে যত অভিযোগ আছে তাঁর কিছুই যে সত্য নয় তা হয়ত এখানে বলার উদ্দেশ্য নয়; কিন্তু এমন অনেক অভিযোগও ইতিহাসে আছে যার কোন উপযুক্ত ভিত্তিই নেই।

যা হোক, সিরাজের সিংহাসনে বসার পরেই নবাবকে অযোগ্য মনে করে ইংরেজরা দুঃসাহসের সাথে কলকাতার ঘাঁটি ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণ করতে

www.nagorikpathagar.org

আরম্ভ করে। ইংরেজরা জানতো সারা ভারতের মিস্তষ্ক বাংলা। তাই কলকাতাতেই ঘাঁটি তৈরির পরিকল্পনাকে রূপ দেয়ার চেষ্টা চলতে লাগল। সিরাজ সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ পাঠালেন, দুর্গ তৈরি বন্ধ করা এবং তা ভেঙ্গে ফেলা নবাবের আদেশ। ইংরেজরা নবাবের আদেশ অগ্রাহ্য করে দুর্গ তৈরির কাজ অব্যাহত রাখে। এক কথায় নবাবের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য তাঁরা আগে থেকেই তৈরি ছিল। সিরাজ পূর্ণ সাহসিকতার সাথে বিদেশী ইংরেজকে আক্রমণ করে এবং ভীষণভাবে পরাজিত করেন। এ যুদ্ধের সাথেই সংযুক্ত (Black Hole) বা অন্ধকূপের কাহিনী।

সিরাজের কলকাতা অধিকারের সংবাদ মাদ্রাজে পৌঁছালে সাথে সাথে বৃটিশ সেনাপতি ক্লাইভ বিরাট সৈন্য সামন্ত নিয়ে কলকাতা পুনর্দখল করেন। সিরাজ বুঝতে পারলেন আর লড়াই করে পারা যাবে না। কারণ ইংরেজদের চক্রান্তে তাঁর বিশ্বাসভাজন হিন্দু ও মুসলমান বন্ধু-বান্ধবও ইংরেজকে জয়ী করার জন্যে সর্বস্ব পণ করে লেগেছেন। ফলে বাধ্য হয়েই তাঁকে ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সাথে সন্ধি করতে হয়। এ সন্ধির নাম হয় 'আলী নগরীর সন্ধি'। সন্ধির শর্তানুযায়ী কলকাতা ইংরেজরা ফিরে পায় এবং শুধু ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের মেরামত বা নির্মাণের অধিকার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু কিছুকালের মধ্যে ইংরেজরাই বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকায় হঠাৎ বঙ্গের চন্দননগর দখল করে এবং সিরাজ-উদ-দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়।

এ ব্যাপারে ইংরেজরা একটা বড় অস্ত্র হাতে পেয়েছিল। বঙ্গের বিখ্যাত জগৎশেঠ এবং কলকাতার বড় বড় ব্যবসায়ী উমিচাঁদ এবং রাজবল্লভ প্রমুখ দেশের শত্রু ও শোষক গোপন আলোচনায় স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে ইংরেজদের দূত মি. ওয়াট্স সাহেবকে পালকিতে করে আনানো হয়। এ সভায় মি. ওয়াট্স প্রচুর পরিমাণে লোভ লালসায় মুগ্ধ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করা হবে এবং এর ফলে বঙ্গ তথা সারা ভারতের মুসলমানদের উত্তেজিত হয়ে ওঠার রাস্তা বন্ধ করতে তাঁরই আত্মীয় মীরজাফরকে সিংহাসনে বসানো হবে। মি. ওয়াট্স আরও জানালেন, সিরাজের সাথে লড়তে যে প্রস্তুতির প্রয়োজন এবং এর জন্য যে প্রচুর অর্থের আবশ্যক তা বর্তমানে আমাদের নেই। জগৎশেঠ সে কর্তব্য পালন করতে সদম্ভে আশ্বাস দিয়েছিলেন, 'টাকা যা দিয়েছি আরও যত দরকার আমি আপনাদের দিয়ে যাব, এতে কোন চিন্তা নেই।'

এবার রাজবল্লভ সিরাজের বড় খালা ঘসেটি বেগমকে বোঝালেন– আমরা চেয়েছিলাম আপনি সিংহাসনে বসবেন। কিন্তু এখনও উপায় আছে, যদি আপনি

www.nagorikpathagar.org

আমাদের অর্থাৎ ইংরেজদের শুধু একটু সমর্থন দান করেন মাত্র।

মীরজাফরকে একটু বোঝাতে বেগ পেতে হল। তিনি প্রথমে বলেছিলেন– 'আমি নবাব আলিবর্দীর শ্যালক; অতএব সিরাজ-উদ-দৌলা আমার আত্মীয়, কি করে তা সম্ভব?' তখন উমিচাঁদ বুঝিয়েছিলেন– 'আমরা ত আর সিরাজকে মেরে ফেলছি না অথবা আমরা নিজেরাও নবাব হচ্ছি না, শুধু তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে আপনাকে বসাতে চাইছি। কারণ আপনাকে শুধু আমি নই, ইংরেজরা এবং মুসলমানদের অনেকেই আর অমুসলমানদের প্রায় প্রত্যেকেই গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখে।'

সুতরাং মীরজাফর উমিচাঁদের বিষপান করলেন। উমিচাঁদের জয় হলে তিনিও পুরস্কৃত হবেন আর মীরজাফর হবেন বাংলার নবাব; এদিকে জগৎশেঠের শোষণের পথ নিষ্কণ্টক হবে আর ইংরেজদের লাভ হবে ভারত আসবে তাদের হাতের মুঠোয়। পক্ষান্তরে সিরাজ-উদ-দৌলার লাভ হলে তা হবে বাংলা তথা ভারতের লাভ।

যা হোক, ষড়যন্ত্রের জাল বোনা যখন শেষ, ভারতের স্বাধীনতা সূর্যকে পরাধীনতার গ্লানিতে কবর দেয়ার সমস্ত পরিকল্পনা যখন প্রস্তুত সে সময় ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ১৩ জুন ক্লাইভ মাত্র তিন হাজার দুইশত সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ যাত্রা করেন। ১৯ জুন নবাবের অধীনস্থ কাটোয়া ক্লাইভের দখলে আসে। ২২ জুন গঙ্গা পার হয়ে ক্লাইভ মধ্য রাতে নদীয়া জেলার সীমান্তে পলাশীর প্রান্তরে পৌঁছেন। নবাবের প্রচুর সুদক্ষ সেনা প্রথম থেকেই তৈরি ছিল। ক্লাইভের তবুও ভয় নেই। কারণ তিনি জানেন এ যুদ্ধ যুদ্ধ নয়, পুতুল খেলার শামিল। আগে থেকেই পরিকল্পনা পাকাপাকি। উমিচাঁদ, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ প্রমুখের সাজানো সেনাপতি আজ ভিতরে ভিতরে ক্লাইভের স্বপক্ষে।

ক্লাইভের সৈন্য যেখানে মাত্র তিন হাজার দুইশত সেখানে সিরাজের সৈন্য পঞ্চাশ হাজার। কিন্তু মীরজাফর, রায়দুর্লভ ও অন্যান্য সেনাপতি পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইলেন আর ইংরেজদের আক্রমণ ও গুলির আঘাতে নবাবের সৈন্য আত্মহত্যার মত মরতে শুরু করল। এ অবস্থায় সেনাপতির বিনা অনুমতিতেই সিরাজের জন্য তথা দেশ ও দশের জন্য মীর মর্দান ভয়াবহ বীরবিক্রমে যুদ্ধ পরিচালনা করে আর পরক্ষণেই গুলিতে বীরের মত শহীদ হলেন। নবাব সিরাজ এ সংবাদে দিশেহারা হয়ে পড়লেন। এ সময় যুদ্ধের গতি নবাবের অনুকূলে যাচ্ছিল। কারণ মীর মর্দানের বীরত্বে মোহনলাল ও সিনফ্রে তখন ইংরেজদের কাবু করে ফেলেছিলেন। এমন শুভ মুহূর্তে নবাবের প্রধান সেনাপতি মীরজাফর যুদ্ধ বন্ধ

www.nagorikpathagar.org

করতে আদেশ দেন। এদিকে ক্লাইভ এ মুহূর্তটির অপেক্ষাতেই ছিলেন। নীরবে মুসলমান ও হিন্দু সৈন্যদের উপর গোলাবর্ষণ চলতে লাগল। অবশেষে নিরূপায় নবাবের সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। নবাবও রাজমহলের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে গিয়ে ধরা পড়লেন এবং তাঁকে বন্দি করা হল। শেষে তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। সে অনেক ইতিহাসের ইতিহাস।

বাংলার বিশ্বাসঘাতক সন্তানেরা এটা বোঝেনি যে, এ পরাজয় শুধু সিরাজের নয়, শুধু বাংলার নয়– সমগ্র ভারতের। আর এ বিজয় ইংরেজ ও ইংল্যান্ডের।

কিন্তু সিরাজ পরাজিত ও নিহত কেন? এর উত্তরে বলা যেতে পারে পলাশীর যুদ্ধ কোন যুদ্ধই ছিল না। কারণ এটা ছিল যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা মাত্র। আসলে যাঁদের তিনি বিশ্বাস করতেন উমিচাঁদ, সেনাপতি রায় দুর্লভ, প্রধান সেনাপতি মীরজাফর আর বঙ্গের শ্রেষ্ঠ ধনী জগতশেঠ, এরাই ছিল সিরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী। শত্রু প্রকাশ্য হলে এর দ্বারা যত ক্ষতি হয়, বন্ধু শত্রু হলে ফল হয় আরও মারাত্মক। পলাশীর যুদ্ধে এ সত্যিই দারুণভাবে প্রমাণিত। তাই দেশহিতৈষী নিরপেক্ষ বিখ্যাত লেখক শ্রী নিখিলনাথ রায় লিখেছেন–

> 'অষ্টাদশ শতাব্দীর যে ভয়াবহ বিপ্লবে প্লাবিত হইয়া হতভাগা সিরাজ সামান্য তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল এবং মীরজাফর ও মীরকাশিম উর্ধ্বক্ষিপ্ত অধক্ষিপ্ত কেহ বা অনন্ত নিদ্রায় কেহ বা ফরিকী অবলম্বনে নিষ্কৃতি লাভ করেন। জগতশেঠ ক্রোধ ঝটিকা সেই তুফানের সৃজনের মূল।
>
> দুঃখের বিষয় সে ভীষণ তুফানে অবশেষে তাহাদিগকেও অনন্ত গর্ভে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। যে ব্রিটিশ রাজা রাজেশ্বরীর শান্তি ধারায় আসমুদ্র হিমাচল স্নিগ্ধ হচ্ছে জগতশেঠগণের সাহায্যই তাহার প্রতিষ্ঠাতা। একজন ইংরেজ লিখিয়াছেন যে, হিন্দু মহাজনের অর্থ আর ইংরেজ সেনাপতির তরবারি বাংলায় মুসলমান রাজত্বের বিপর্যয়। যে ব্রিটিশ রাজলক্ষ্মীর কিরিটি প্রভায় সমস্ত ভারতবর্ষ আলোকিত হইতেছে মহাপ্রাণ জগৎশেঠগণের অর্থ বৃষ্টিতে ও প্রাণপাতে তাহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়।' (ঐতিহাসিক চিত্র, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য)

শ্রীঘোষও তাঁর ইতিহাসের ৫১৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন–

> 'আজকের যে কোন বালকও বুঝিতে পারে যে পলাশীর যুদ্ধ শুধু যুদ্ধ যুদ্ধ খেলার মত অভিনয় ছাড়া কিছু নয়।'

www.nagorikpathagar.org

ইংরেজরা যখন ক্লাইভের বিচার করেছিল তখন ক্লাইভ শাস্তিপ্রাপ্ত চোরের মত কোর্টে দাঁড়িয়ে যে উত্তর দিয়েছিলেন তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ–

> 'চল্লিশ লাখ পাউন্ড স্টার্লিং কর এবং সে পরিমাণ ব্যবসায়ে লাভ হতে পারে এমন একটা সাম্রাজ্য আপনাদের জন্যই আমি জয় করেছিলাম। এর পারিশ্রমিক হিসেবে আপনারা আমার সাথে যে ব্যবহার করেছেন, আমি যেন একজন ভেড়া চোর।'

তাহলে ভারতের মানুষের এতবড় সর্বনাশ সাধন করার উদ্দেশ্য কি? এর উত্তরে অনেকে অনেক কথা বলেন। একদল বিচক্ষণ পন্ডিতের মত সাম্প্রদায়িকতাই প্রধান কারণ। মুর্শিদাবাদের কথা বলতেই মনে পড়ে যায় মুসলমান মুর্শিদ কুলীর নাম। কিন্তু তিনি মুসলমান ছিলেন বলেই তাঁর অপরাধ ছিল না; বরং তাঁর বড় অপরাধ ছিল তিনি ব্রাহ্মণের সন্তান হয়েও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন।

(এশিয়াটিক সোসাইটির সংরক্ষিত অক্ষয়কুমার মৈত্রের সম্পাদিত 'ঐতিহাসিক চিত্র' দ্রষ্টব্য)

www.nagorikpathagar.org

সিরাজের ইতিহাসে জগৎশেঠের ভূমিকা

পৃথিবীর ইতিহাস সমালোচনা করে জানা যায়, ইংরেজরা মুসলমান শক্তির সাথে লড়াই-এ সবসময়ই অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরাজিত হয়েছে। এর ফলস্বরূপ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সারা বিশ্বে মুসলমান রাষ্ট্রের সৃষ্টি। ক্রুসেডের যুদ্ধগুলোতেও মুসলমানদের বীরত্ব অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

ভারতে ব্যবসাদার ইংরেজ রাজা হয়ে বসতে পারত না, যদি তাদের হাতে ভারতের বিশ্বাসঘাতকদের সহযোগিতা না থাকত। যে বা যাদের বিশ্বাসঘাতকতায় ইংরেজরা ভারতের মাটিতে তুলাদন্ডের পরিবর্তে রাজদন্ড ধারণ করতে সক্ষম হয়েছিল তাদের মধ্যে জগৎশেঠদের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভারতের যোধপুরের একটি দরিদ্র পরিবারের হীরানন্দ অভাবের জ্বালায় মাতৃভূমি ত্যাগ করে, বঙ্গদেশের এক গ্রামে একটি পর্ণকুটিরে মৃত্যু শায়িতা বৃদ্ধার সেবা করার সুযোগ পান। সে বৃদ্ধার মৃত্যুর পর তার গচ্ছিত কিছু টাকা হীরানন্দের মূলধনে পরিণত হয়। এমনিভাবে এ বংশের মানিক চাঁদের সাথে মুর্শিদকুলী খাঁর ভালবাসা হয়। মানিক চাঁদ কাজ গুছিয়ে বেশ উঁচু ধাপে উঠতে থাকেন। ১৭১৫ খ্রিষ্টাব্দে বাদশাহ ফররুখ শিয়ারের কাছে সুপারিশ করে মুর্শিদকুলী খাঁ তাকে শেঠ উপাধি দান করেন। হিন্দু মুসলমান ভালাবাসাবাসিরই এক ঐতিহাসিক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এ শেঠ উপাধি দান। (রিয়াজুস সালাতি Stewarts History of Bengal)

শেঠ বংশের ফতেহ চাঁদই প্রথমে জগৎশেঠ উপাধি প্রাপ্ত হন। আবার রিয়াজুস সালাতিনে ২৭৪ পাতায় পাওয়া যায় মুহাম্মদ শাহ ও জগতশেঠ উপাধি দিয়েছিলেন, তার সাথে মতির মালা এবং কয়েকটি হাতি। সম্রাট মুহাম্মদ শাহকে শেঠজী তোষণ ও সেবায় এতই মুগ্ধ করেন যে, মুর্শিদকুলী খাঁর উপর একবার বিরক্ত হয়ে ফতেহ চাঁদকেই নবাব করতে চেয়েছিলেন। মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যুর সময়ে তাঁর টাকা শেঠদের বাড়িতে যা জমা রাখা ছিল তার পরিমাণ সে বাজারের সাত কোটি টাকা যা শেঠজীরা কোনদিন ফেরত দেননি। (মুর্শিদাবাদ কাহিনী, নিখিল চন্দ্র রায়, পৃ. ৫৬ দ্র.)

এ অর্থই যত অনর্থের মূল। সারা ভারতে বহু স্থানে শেঠদের গদি ছিল। ইংরেজরা প্রথম শেঠদের হাত করেন এবং শেঠরা যত টাকা প্রয়োজন দিতে প্রতিশ্রুত হন। এরপর জগতশেঠের বাড়িতে গোপন বৈঠক বসে। সে বৈঠকে

www.nagorikpathagar.org

সাহেবদের সাথে সারা ভারতকে তথা সিরাজকে ধ্বংস করতে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন জগৎশেঠ, রাজা মহেন্দ্ররায় (দুর্লভ রায়), রাজা রামনারায়ণ, রাজা রাজবল্লভ, কৃষ্ণদাস ও মীরজাফর প্রমুখ।

একজন প্রস্তাব করেন যবনকে নবাব না করে হিন্দুকে নবাব করার জন্যে। রাজা কৃষ্ণ চন্দ্র মুসলমান মীরজাফরের দিকে দৃষ্টি দিয়ে লজ্জিত ও থতমত খেয়ে বলেন, মীরজাফরকেই নবাব করে আমরা সিরাজকে সরাতে চাই। উদ্দেশ্য ছিল, মুসলমানগণ ক্ষেপে উঠবে না, মুসলমান নবাবের পরিবর্তে মুসলমান নবাব মাত্র। অনেক বাদানুবাদের পর জগৎশেঠ বলেন, রাজাকৃষ্ণ চন্দ্রের কথাই যুক্তিসঙ্গত। 'আমরা কেউ নবাব হলে অন্য বিপদ আছে।' সাথে সাথে এ মত চূড়ান্ত বলেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

তাই বলা যায়, ভারতে ইংরেজ রাজ্যই শুধু তাদের গোলাগুলি আর মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতাতেই প্রতিষ্ঠিত নয়; বরং শেঠজীদের বিশ্বাসঘাতকতাই এর পশ্চাতে প্রধানতম সহায়ক।

উল্লেখ করা যেতে পারে, শেঠজীদের দেশদ্রোহিতা ও বিশ্বাসঘাতকতা মীরজাফরের তুলনায় কোন অংশেই কম ছিল না এবং শেঠজীদের বিপুল অর্থ সাহায্যই ইংরেজদের এমন দুঃসাহসিক অভিযানের গোড়াপত্তন। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণও এ বিরাট সত্যকে একেবারে হজম করতে পারেননি, তাই বলেছেন–

> 'The rupees of the Hindu banker, equally with the sword of the English colonel contributed to the overthrough of the Mahammedan power in Bengal.'

বাংলা মুসলমান শক্তিকে ধ্বংস করতে (ভারতকে পরাধীন করতে) ব্রিটিশ সেনাপতির তরবারির সাথে হিন্দু ধনপতিদের অর্থ সম্ভারও সমানভাবে সহযোগিতা করেছিল।

শেঠজীরা শুধুমাত্র ইংরেজদের হাতেই অর্থ দেননি, সিরাজের সৈন্যদের পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ সরবরাহ করে ইতিহাসকে কলংকিত করেছেন। আরও দুঃখের কথা, সিরাজকে হত্যা করার প্রস্তাব ইংরেজ সর্দারকে এ জগতশেঠই দিয়েছিলেন।

'মুর্শিদাবাদ কাহিনী'র লেখক নিখিল বাবু বড় দরদ দিয়ে লিখেন–

www.nagorikpathagar.org

'হতভাগ্য রাজ্যহারা হয়ে অবশেষে প্রাণভিক্ষার জন্য প্রত্যেকের পদতলে বিলুণ্ঠিত হইয়াছিল, তাহারা প্রাণ দানের পরিবর্তে যদি প্রাণনাশের কেহ সম্মতিও দিয়ে থাকে তাহা হইলে তাহার ঘৃণিত ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক যে সর্বদা নিন্দনীয় এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে।'

জগৎশেঠের মৃত্যু হয়েছিল উচ্চ পর্বত থেকে নিচে নিক্ষিপ্ত হয়ে। পৃথিবীর প্রখ্যাত ধনী বংশ দরিদ্রতর থেকে সৃষ্টি হয়ে দরিদ্রতম গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে তাদের ভগ্নস্তূপের পাশে বিচরণ করেছিল।

www.nagorikpathagar.org

সিরাজ-উদ-দৌলার বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা সম্পর্কিত ইতিহাসকে সাহিত্য, নাটক, উপন্যাস, গ্রামোফোন রেকর্ড ও সিনেমা প্রভৃতিতে প্রচার দ্বারা যেভাবে কলঙ্কিত করা হয়েছে তা অত্যন্ত পরিতাপের।

নবাব নাকি চরিত্রহীন ও মদপায়ী ছিলেন। তিনি নাকি নিষ্ঠুর ছিলেন– এ অপবাদ প্রমাণিত হয় তাঁর অন্ধকূপ হত্যার দ্বারা। দুইশত ইংরেজকে ছোট্ট একটি অন্ধকার কক্ষে খাদ্য, পানীয় ও বাতাসের অভাব ঘটিয়ে হত্যা করা হয়েছিল বলে নিরীহ সিরাজের নামে কলঙ্ক দেয়া হয়েছে। তাছাড়া আরও বহু অভিযোগ আছে সিরাজের নামে।

আমাদের দেশে ইংরেজদের দালালির দলে যারা যোগ দিয়েছিলেন তারা আজও সিরাজকে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদের সম্মানে ভূষিত করতে পারেননি। এছাড়া বিশ্বাসঘাতকতা যতটুকু হয়েছিল সিরাজকে ঘিরে এর সবটুকুই যেন চাপানো হয়েছে কুখ্যাত মুসলমান মীরজাফরের ঘাড়ে। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস তা বলে না।

সিরাজ-উদ-দৌলা অল্প বয়সে একবার মদপানের কলঙ্কে কলঙ্কিত হয়েছিলেন। কিন্তু আলিবর্দী প্রাণপ্রিয় সিরাজকে ডেকে মদ আর কোন দিন স্পর্শ না করার জন্য কুরআন ছুঁয়ে শপথ করতে বলেন। তাতে সিরাজ বলেছিলেন,

'নানা, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। সিরাজ জীবনে কোন দিন মদ স্পর্শ করবে না। যদি করি তাহলে আমি আপনার নাতি নামের কলঙ্ক।'

বলাবাহুল্য, সিরাজ তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন সারা জীবন।

এছাড়াও নারীর লোলুপতার যে মিথ্যা অপবাদটি তাঁর উপর আরোপ করা হয়েছে তাও ভিত্তিহীন এবং এটা ইংরেজ ও তাদের দালালদের সৃষ্ট এক কৌশল অবলম্বন মাত্র। গ্রামোফোন রেকর্ডে সিরাজের কণ্ঠে বলা হয়– 'প্রথম যৌবনের উন্মাদনায় নারী অনেক চেয়েছি, পেয়েছিও...' ইত্যাদি। যখন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা তথা ভারতের ভাগ্য নিয়ে যুদ্ধ চলছে মীর মর্দান নিহত, সৈন্যদের বিশ্বাসঘাতকতায় সিরাজের চোখে অশ্রু তখন রেকর্ডে আমরা শুনি তিনি আলেয়াকে নিয়ে প্রেমলীলায় মত্ত! এত বড় ভুল বাঙালি হয়ে বাঙালির বিরুদ্ধে

www.nagorikpathagar.org

মানুষ কি করতে পারে? তা কি সম্ভব? তবুও কাল যা সম্ভব ছিল না, আজ হয়ত তা সম্ভব এবং আগামীতেও কল্পনা করা আকাশ কুসুম নয় যে, আজকের সুধী সমাজ গড়ে তুলবে পূর্বপুরুষদের মিথ্যা ইতিহাসের বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিরোধ।

সুধীর কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন–

> 'সিরাজ অতিরিক্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি প্রায় নদীতে বন্যার সময় নৌকা হইতে আরোহীদিগকে উল্টাইয়া দিয়া ডুবাইয়া দিয়া এক সাথে এক দুইশত যুবক, যুবতী, স্ত্রী, বৃদ্ধ, শিশু সাঁতার না জানায় পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার নিষ্ঠুর দৃশ্যটি উপভোগ করিয়া আনন্দ লাভ করিতেন।'

এ প্রমাণহীন মিথ্যা কাহিনী পড়ে হয়ত অনেকেই বলতে পারেন সুধীর বাবু তেমন দামি নামী লোকের মধ্যে গণ্য নন; সুতরাং গুরুত্ব না দেয়াই ভাল। কিন্তু বিখ্যাত কবি, উচ্চ ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি বাবু বা নবীনচন্দ্র সেন যদি অনুরূপ বা ততোধিক মারাত্মক কিছু বলে বা লিখে থাকেন তাহলে সুধীর বাবুরই বা লেখা দোষের হবে কেন? নবীনচন্দ্র সেন শুধু নৌকায় নবাবের নরহত্যার কথা লিখেই ক্ষান্ত হননি; বরং আরও নতুন সৃষ্টি করেছেন। বিশেষ করে 'গর্ভিণীর বক্ষ বিদারক' এর ঘটনা অর্থাৎ সিরাজ নাকি জীবন্ত গর্ভবতী নারীর পেট কেটে সন্তান দেখতেন। এমনি আরও কত আজগুবী আর অবাস্তব কিংবদন্তীর অবতারণা করে সিরাজের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করার জঘন্যতম প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। সিরাজের অন্ধকূপ হত্যার ইতিহাসটিও এরই প্রতিচ্ছবি। যার সত্যতা সম্পর্কে অমর সাক্ষী নাকি কলকাতার ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত কুখ্যাত মনুমেন্ট!

www.nagorikpathagar.org

অন্ধকূপ হত্যার নেপথ্য ইতিহাস

সিরাজের অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। শাসকদের চরিত্রে মসী লেপনের এক অদ্ভুত ঐতিহাসিক প্র্যাকটিস। তাই অন্ধকূপ হত্যা (Black Hole) সম্বন্ধে একটু আলোচনা দরকার। সুধীর বাবু তাঁর রচনায় বাংলা তথা ভারতের কল্যাণের জন্য বেশ বুদ্ধিমানের ও মস্তিষ্কের উর্বর পরিচয় দিতে চেষ্টা করে গেছেন। 'অন্ধকূপ হত্যার' চেষ্টা সুধীর বাবু নন, তিনি হচ্ছেন ইংরেজ অনুচর মি. হলওয়েল (Halwell)। এ হলওয়েলকে শ্রী সুধীর বাবু সত্যবাদী ও প্রকৃত ঐতিহাসিকের মর্যাদা দিয়েছেন। সুধীর বাবু মোটামুটি চারটি পয়েন্টের উপর চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন।

প্রথমত– যেহেতু হলওয়েল এ ঘটনার নায়ক সেহেতু অন্ধকূপ সম্বন্ধে তার মন্তব্য ও বক্তব্য অবশ্যই গ্রহণযোগ্য।

দ্বিতীয়ত– মি. হলওয়েলের প্রকাশিত তথ্য প্রমাণ করে তারা অন্তত: মিথ্যাবাদী নন। অতএব, তাদের কথাই সত্য।

তৃতীয়ত– যদি এ কথা মিথ্যা হত তবে উধৎশ এবং ঈড়ঁহপরষষড়ৎ-গণ এটাকে মিথ্যা প্রমাণ করার চেষ্টা করেননি কেন?

চতুর্থত– হলওয়েলের স্বজাতির মধ্যে যারা তার শত্রু তারাই বা প্রতিবাদ করেননি কেন? অতএব উপর্যুক্ত সত্যতার ভিত্তিতে কলিকাতায় Halwell Monument (হলওয়েল মনুমেন্ট) স্থাপিত।

উপরের আলোচনা থেকে অন্ধকূপ হত্যার ব্যাপারে অনেকের নিকট মনে হতে পারে যে, যা রটে তা অন্তত 'কিছু' বটে। অর্থাৎ সিরাজের অন্ধকূপ হত্যার কাহিনীকে হয় তো নিছক গল্প বলে উড়িয়ে দেয়া যাবে না। কিন্তু তবুও বাধাবুলিতে মুগ্ধ হবার চেয়ে একটু যুক্তিতর্কের আশ্রয়ে পূর্ণ তথ্যটি আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমানের পরিচয়।

এবার জনাব হলওয়েলের চরিত্রটা যাচাই করা কর্তব্য। এ হলওয়েল সাহেবই মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করার ষড়যন্ত্র করে মীর কাশিমকে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন এবং তিন লক্ষ নয় হাজার তিনশত টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন। এর জীবন্ত প্রমাণ ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দের Report of the Committee of the House of Commons দ্রষ্টব্য। এ হলওয়েলই বিলেতে পত্র লিখেছিলেন যে,

www.nagorikpathagar.org

'নবাব মীরজাফর আলী খাঁর জঘন্য চরিত্রের কথা কি আর জানাব! তিনি ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে জুন মাসে নওয়াজেস মহিষী ঘষেটী বেগম, সিরাজের মা আমিনা বেগম ইত্যাদি সম্ভ্রান্ত মহিলাদের ঢাকার রাজ কারাগারে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছেন।'

এ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে হলওয়েল যে মস্তবড় এক বোকা ও মিথ্যাবাদী তা প্রমাণিত। কারণ হলওয়েল যখন ঢাকায় রাজমহিলাদের মৃত্যু কাহিনী রচনা করেন এর পরও তারা স্বশরীরে জীবিত ছিলেন। (Long's Seliction from the record of India, Vol-1 দ্র.)

হলওয়েলের হিসাব

জনাব হলওয়েলের লেখাতেও প্রমাণ হয় সিরাজের কলকাতা আক্রমণের পূর্বে কলকাতা দুর্গে ষাটজন মাত্র ইউরোপিয়ান ছিলেন। এ ষাট জনের মধ্যে গভর্নর ড্রেক, সেনাপতি মিনচিন, চারর্লস্‌ডগলাস, ওয়েভার ব্যারন, ক্যাস্টনহেরী, লে. মেপল টফট, রেভারেন্ড ক্যাস্টন, ফ্রাঙ্কল্যান্ড, মানিংহাম ও গ্রান্ট প্রমুখ দশজন বীরপুরুষ পালিয়ে গিয়েছিলেন।

তাহলে হলওয়েলের মতে ষাট থেকে দশ গেলে বাকি থাকে পঞ্চাশ অর্থাৎ সিরাজের হাতে মাত্র পঞ্চাশ জনের প্রাণহানি হয়। কিন্তু এ হলওয়েল আবার কি করে শতাধিক লোকের মৃত্যু সংবাদ পরিবেশন করেছেন তা বড়ই আশ্চর্যের বিষয়। এ তথ্যগুলোর প্রমাণ মেলে 'Halwell's Letter to the Honble the court of directors, dated Falta, 30 the Nov. 1756 Para 36' দ্রষ্টব্য।

কার্যত বিভিন্ন ঐতিহাসিক হিসাব বা গবেষণার দ্বারা প্রমাণিত হয়, মাত্র ৮ থেকে ১০ জন ইংরেজ দুর্গে বর্তমান ছিল। হলওয়েলের কুকীর্তির স্বরূপ দেখে নিরপেক্ষ দৃষ্টিসম্পন্ন বাংলার সন্তান ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্র বলেন–

> 'মুসলমানদের কথা ছাড়িয়া দাও। তাঁহারা না হয় স্বজাতির কলঙ্ক বিলুপ্ত করিবার জন্য স্বরচিত ইতিহাস হইতে এই শোচনীয় কাহিনী সযত্নে দূরে রাখিতে পারেন। কিন্তু যাহারা নিদারুণ যন্ত্রণায় মর্মপীড়িত হইয়া অন্ধকূপ কারাগারে জীবন বিসর্জন করিলেন তাহাদের স্বদেশীয় স্বজাতির সমসাময়িক ইংরাজদিগের কাগজপত্রে অন্ধকূপ হত্যার নাম পর্যন্তও দেখিতে পাওয়া যায় না কেন?'

হেমলতা দেবী লিখিত 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' পুস্তকের সমালোচনায় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর লেখা 'ইতিহাস' পুস্তকের দ্বিতীয় মুদ্রণে ১৫৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

> 'সিরাজুদ্দৌলার রাজ্য শাসনকালে অন্ধকূপ হত্যার বিবরণ লেখিকা অসংশয়ে প্রকাশ করিয়াছেন। যদি তিনি শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রের 'সিরাজুদ্দৌলা' পাঠ করিতেন তবে এ ঘটনাকে ইতিহাসে স্থান দিতে নিশ্চয়ই কুণ্ঠিত হতেন।'

www.nagorikpathagar.org

পলাতক ইংরেজ বীরপুরুষগণের পলায়নের বিবরণে বা সিরাজের প্রতি পিগটের পত্রে অথবা সিরাজকে লিখিত ওয়াটগণের ও ক্লাইভের বীরত্বপূর্ণ পত্রে অন্ধকূপের উল্লেখ নেই। এমনকি আলিনগরের সন্ধির কাগজেও এর উল্লেখ নেই। ক্লাইভ কোর্ট অফ ডিরেক্টরকে যে পত্র লিখেছেন তাতে সিরাজকে কেন সিংহাসনচ্যুত করা হয়েছে এর বিবরণ আছে কিন্তু অন্ধকূপ হত্যার কোন কথাই সেখানে নেই। অথচ সুধীর কুমার আর নবীন কুমারের নবীন কলম কোন রকম তথ্য-প্রমাণ ছাড়াই গায়ের জোরে 'অন্ধকূপ হত্যা' নামক কাল্পনিক ঘটনাকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়েছে। অবশ্য তাদের এহেন ধৃষ্টতা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

সিরাজবিদ্বেষী আগ্রাসী ইংরেজদের কল্পিত অন্ধকূপে প্রায় দু'শ' জন লোকের বন্দির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সে ঘরটির আয়তন হচ্ছে মাত্র ১৮×১৪। সুতরাং স্থান সংকুলান হয় না দেখে কমিয়ে ১৪৬ জন ধরা হয়েছে। কিন্তু শয়তানের দল যখন দেখল এ পরিমাণ স্থানে ১৪৬ জনেরও স্থান সংকুলনা হতে পারে না তখন সাথে সাথে স্বর পাল্টে ১৪৬ থেকে মাত্র ৬০ সংখ্যায় এনে দাঁড় করানো হল। একেই বলে ইতিহাস!

নীতিভ্রষ্ট ও ব্যবসাদার কবি-সাহিত্যিক-ঐতিহাসিকরা মা-মাটি-মানুষের শত্রু, তাদের নীতি হচ্ছে– 'মামার জয়' বলার মত। অর্থাৎ যখন যেদিকে বাতাস বইবে সেদিকেই লিখে যাওয়া, স্রোতের টানে ভেসে যাওয়া। বীর তারাই যারা প্রয়োজনীয় বিষয় সকল বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করেও সমাজের সামনে তুলে ধরতে সাহসী হন। তাই অক্ষয় কুমার, সুভাষ বোস প্রমুখ বীর সন্তানদের প্রতি ধন্যবাদ যে, যখন দেশ স্বাধীন হয়নি সে সময় ইংরেজদের বিরুদ্ধে কথা বলা বা আন্দোলন করা খুবই বীরত্বের পরিচয় সন্দেহ নেই।

১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে সুভাস বোস এ অন্ধকূপ হত্যার মনুমেন্টটি ভেঙে ফেলার দাবি করেন। ফলে বিরাট আন্দোলন হয়। শত্রু ও ইংরেজ এবং মুসলমান বিদ্বেষী অনেক অমুসলমানই সেদিন অবাক অথবা অসন্তুষ্ট হন কিন্তু সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী, তবে ধৈর্যের প্রয়োজন। শেষে ইংরেজ রাজত্বের রাজধানী কলকাতার এ মনুমেন্ট ইংরেজরই ভেঙে ফেলতে বাধ্য হয়।

এদিকে গিরিশ ঘোষ 'সিরাজউদ্দৌলা' নামে একটি সঠিক সুন্দর বই সাহসের সাথে লিখেছেন। এর উপর অক্ষয় বাবুর 'সিরাজউদ্দৌলা ও মীরকাসিম' অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করে। পরে সত্যচরণ শাস্ত্রী একটি বই লিখলেন এর নাম 'জালিয়াত ক্লাইভ'। এরপর সখারাম গণেশ দেউস্কর 'দেশের কথা' নাম দিয়ে এ

সম্বন্ধেই আর একখানা বই লিখেন। এটিও বেশ উপাদেয় বই। এর দু'একটি বাক্য এখানে তুলে ধরছি–

> *'ইংরেজ ইতিহাস লেখকেরা হিন্দু ছাত্রদের হৃদয়ে মুসলমান বিদ্বেষ প্রজ্জ্বলিত রাখিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। পরিতাপের বিষয়, কোন কোন অদূরদর্শী হিন্দু লেখক কাব্য নাটকাদিতে অনর্থক মুসলমান ভ্রাতাদিগের নিন্দাবাদ করিয়া ইংরাজের উদ্দেশ্য সিদ্ধি বিষয়ে সহায়তা করতেছেন।'*

উক্ত মন্তব্যটি পাঠক-পাঠিকাবৃন্দকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, সমাজের বর্তমান অবস্থা সখারাম-এর লেখারই অনুরূপ মাত্র। যা হোক, বিরাট ইতিহাস সমুদ্রের মাত্র এক পাত্র নোনা পানিকে সিরাজকেন্দ্রিক কলমে পরিশ্রুত করা হয়েছে। কিন্তু বাকি তথ্য আর কতদিন দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সুভাষ আর অক্ষয়ের অপেক্ষা প্রতীক্ষা করবে তা বলা মুশকিল।

আবার এদিকে গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় একটি লিখেছেন যা সহজে বিষাক্ত ও চলতি নাটকের একেবারে উল্টো। সাধারণ মানুষের মস্তিষ্ক একটু নড়ে উঠল– তাহলে ইতিহাসে যা শুনি না তা ঠিক না। কবি নবীনচন্দ্র সেন এ বইটি পড়ে একটি পত্র লিখেলেন গিরিশচন্দ্রের নামে; তাও এখানে তুলে ধরা হল–

> *ভাই গিরিশ,*
>
> *বিশ বৎসর বয়সে আমি পলাশীর যুদ্ধ লিখিয়াছিলাম, আর তুমি ষাট বৎসর বয়সে 'সিরাজুদ্দৌলা' লিখেছ। আমি বিদেশী ইতিহাসে যেভাবে পাইয়াছি সেইভাবে চিত্রিত করিয়াছি, কিন্তু তুমি সিরাজের নিখুঁত চিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছ। অতএব তুমি আমার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, আমার অপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান।'*

অত্যন্ত বেদনার বিষয় এই যে, সিরাজের ইতিহাসে শুধু যেন মনে হয়, মুসলমান মীর জাফরের কথা, যেন প্রমাণ হয় মুসলমান জাতি মানেই বিশ্বাসঘাতক জাতি। তাই আজ মুর্শিদাবাদ জেলা ও মুসলমান জাতি পর্যন্ত বাংলার বাতাসে যেন কলঙ্কিত। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস এই যে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার অম্লান অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল মুসলমানদের হাতেই। তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা, হাজী শরীয়তুল্লাহর ফরায়েজি আন্দোলন, ১৮৫৭ সালের 'আজাদী আন্দোলন' তার জ্বলন্ত প্রমাণ, আর এ 'আজাদী আন্দোলন' বা 'সিপাহী বিদ্রোহে'র গোড়াপত্তনের দাবিতে যে জেলা ইতিহাসে গৌরবের অধিকারী তা হ'ল

www.nagorikpathagar.org

মুর্শিদাবাদের সদর শহর 'বহরমপুর'। কিন্তু পলাশীর অন্যতম খল চরিত্র মুসলমান মীর জাফরের প্রসঙ্গ টেনে গোটা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের অপরিসীম ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সংগ্রামকে হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা করে যাচ্ছেন কতিপয় দুর্বৃত্ত ঐতিহাসিক। যে জাতি স্বাধীনতার জন্যে দিলো খুন, যারা দিলো জীবন, তাদের ভাগ্যে পুরস্কারের পরিবর্তে তিরস্কার। আর যে জাতি স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করলো, যারা এদেশে ইংরেজদেরকে প্রতিষ্ঠিত করলো তারা বনে গেল ইতিহাসের নন্দিত নায়ক!

www.nagorikpathagar.org

সিরাজউদ্দৌলা কি আসলেই নিষ্ঠুর ছিলেন

সিরাজ কি সত্যিই নিষ্ঠুর ছিলেন? এ প্রশ্নে অনেকে বিচলিত হন। অথচ ইতিহাস প্রমাণ করে সিরাজ কোন অর্থেই নিষ্ঠুর ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি।

সিরাজ মীর জাফরের হাবভাব জানতেন। তাহলে প্রশ্ন হল, সিরাজ যদি জানতেন মীর জাফরের দ্বারা স্বাধীন ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা তৈরি হবে তাহলে কেন তাকে আগেই সরিয়ে দেননি? স্বাধীন ভারতের প্রতি সিরাজের এটা কি নিষ্ঠুরতা নয়? উত্তরে বলব– না। কারণ মীর জাফর সিরাজের সম্মুখে পবিত্র কুরআন ছুঁয়ে শপথ করে বলেছিলেন, তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিংহাসন রক্ষা করতে চেষ্টা করবেন। তাই পবিত্র কুরআনের সম্মানার্থে বিশ্বাসঘাতকতার পূর্বেই তাকে শাস্তি দিতে পারেননি। এটা নিষ্ঠুরতা না উদারতা তা সহজেই অনুমান করা যায়।

বীর সিরাজ ওয়াট সাহেবকে সপরিবারে বন্দি করে কাশিম বাজার থেকে মুর্শিদাবাদ নিয়ে এসেছিলেন। সিরাজ জননী আমিনার কোমলতায় সিরাজের করুণাবতী স্ত্রী লুৎফুন্নেসা তাদের মুক্তি দিয়েছিলেন। যখন সিরাজ ঘটনাটা শুনলেন, তখন গর্ভধারিণী মা বা সহধর্মিণী স্ত্রী কাউকেই তিরস্কার অথবা কৈফিয়ত চাইবার কোন ভূমিকাই তিনি গ্রহণ করেননি। এটাও সিরাজের সহনশীলতা, সহিষ্ণুতা ও উদারতা না নিষ্ঠুরতা এরও বিবেচনার ভার পাঠক পাঠিকাদের উপর থাকল।

রাজা রাজবল্লভ আলিবর্দীর আমলে প্রজাদের সর্বনাশ সাধন করে যে বিরাট অঙ্কের ধন সঞ্চয় করেছিলেন এবং তাঁর পুত্র কৃষ্ণরায় মারফত সেই অর্থ যখন ইংরেজদের ঘাঁটিতে পাচার হয়েছিল, তখন সিরাজ-রাজবল্লভ ও তাঁর পুত্র কৃষ্ণরায়ের উপর স্বাভাবিকভাবেই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। ঠিক এর পরেই তিনি কলকাতার দুর্গ নির্মাণের অপরাধে কলকাতা আক্রমণ করেছিলেন এবং বিশ্বাসঘাতক হলওয়েল, কৃষ্ণদাস ও উমিচাঁদকে ইংরেজদের নিকট থেকে বন্দি করে নবাবের সামনে আনা হল। বলাবাহুল্য, এ কৃষ্ণদাসের পাচার করা বিপুল পরিমাণ অর্থই কলকাতা দুর্গ নির্মাণে ইংরেজদের হাত শক্ত করেছিল। তাই বলা যায়, কৃষ্ণদেবের অপকর্মকে কেন্দ্র করেই সিরাজের কলকাতা অভিযান। সিরাজ যখন তাদের হাতের মুঠোয় পেলেন তখন তারা জানতেন প্রাণদন্ডই আমাদের উপযুক্ত শাস্তি। কিন্তু তিনজনই ক্ষমা প্রার্থনা করলেন আর সিরাজ প্রত্যেককে ক্ষমা করে মুক্তি দিয়ে ক্ষমাধর্মের অতুলনীয় মাহাত্মকে অক্ষুণ্ন রাখলেন। এটি কি সিরাজের নিষ্ঠুরতা?

www.nagorikpathagar.org

সিরাজউদ্দৌলার ঐতিহাসিক নিমজ্জন

এটি সত্য যে, সিরাজ আওরঙ্গজেবের ন্যায় ইসলামের পূর্ণ প্রতীকও যেমন ছিলেন না তেমনি আকবরের ন্যায় স্বধর্মের নিপাত সাধনে অগ্রগামী নায়কও ছিলেন না; বরং তাঁকে ধর্মভীরু বলার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতাও নেই। কেননা, যখন তিনি বন্দি ছিলেন, তখন তাঁর কক্ষে মুহম্মদী বেগ উলঙ্গ তরবারি হাতে প্রবেশ করলেই সিরাজ অনুমান করেছিলেন তাঁর মৃত্যু আগত। তখন সিরাজ কাতরকণ্ঠে বললেন–

> 'মুহম্মদী বেগ! তুমি আমায় কতল করতে এসেছ?'

মুহম্মদী বেগ তখন নিশ্চুপ। নবাবের মুখের দিকে তাকাতেও যেন সে অপারগ। আবার কাতরকণ্ঠে নবাব বলেন–

> 'আমাকে কি তোমরা সামান্য একটা অসহায় গরিবের মত বেঁচে থাকতেও দেবে না?'

এবার মোহম্মদী বেগ গলাটা সামান্য পরিষ্কার করে বলল–

> 'না, তারা তা দেবে না। আমিও চাই না হুসেন কুলীর মৃত্যু হোক'।

বাংলা বিহার উড়িষ্যা তথা সারা ভারতের দেদীপ্যমান আলোকবর্তিকা নবাব সিরাজুদ্দৌলা তাঁর কোটি কোটি দেশবাসীর চোখের আড়ালে অশ্রু মুছে আবার কাতরকণ্ঠে বলেন–

> 'আমাকে একটি বার সুযোগ দাও, আল্লাহর সন্নিধানে যাবার পূর্বে শেষ দুই রাকাত নামায পড়ে নিই।'

মোহম্মদী বেগের চোখে অশ্রুর বন্যা বইছে। অশ্রু বর্ষণ শেষে কিছু দেখতে পায় না সে, উত্তরও দিতে পারে না। নবাব বুঝলেন 'মৌনং সম্মতি লক্ষণম্'-মৌনতা সম্মতির লক্ষণ। তাই জীবনের অন্তিম প্রার্থনা নামাযে আত্মনিয়োগ করলেন, রাব্বুল আলামিন আল্লাহ্ পাকের দরবারে ভিখারির বেশে দাঁড়ালেন। নামায তখনও শেষ হয় নাই, দূরে বাঁশির সংকেত শুনে মুহম্মদী বেগ প্রার্থনারত অবস্থাতেই তরবারি চালনা করল নবাবের পিঠের উপর। তরবারির আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন নবাব। এরপর আরও কয়েকটি আঘাত করল মুহম্মদী বেগ। সিরাজ শুধু একবার বলেছিলেন–

> 'আল্লাহ তুমি আমায় ক্ষমা কর।'

www.nagorikpathagar.org

এরপর রক্তাক্ত সিরাজ শুধু আল্লাহ আল্লাহ শব্দ করতে করতেই নশ্বর এ পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিলেন।

এ ঘটনায় অল্পজ্ঞানী পাঠক, মুসলমান ভৃত্য কত বিশ্বাসঘাতক ও নিষ্ঠুর হতে পারে এরই শিক্ষা পাবে। কিন্তু সূক্ষ্ম ও সুস্থ জ্ঞানীর নিকট ধরা পড়বে আসল রহস্য।

ইংরেজরা যখন সিরাজকে পিঞ্জিরাবদ্ধ পাখির মত বন্দি করেছিল, তখন সিরাজের সমস্ত চাকর চাকরানী আর সিরাজের ছিল না; বরং ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্লাইভ আর ওয়াট্সের হাতের পুতুল হয়ে গিয়েছিল। এমতাবস্থায় ইতিহাসে মুসলিম চরিত্রকে কলঙ্কিত করার পরিকল্পিত বুদ্ধিতেই সিরাজের সাহায্যপুষ্ট মুহম্মদী বেগ এতে রাজি না হওয়ায় তারও প্রাণদন্ড হবে বলে তাকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল। তখন অনন্যোপায় নিরক্ষর বোকা মুহম্মদী বেগ অশ্রু সংবরণ করে মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সিরাজকে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছিল। যদি মুহম্মদী বেগ শিক্ষিত ও জ্ঞানী হত তাহলে হয়ত ইংরেজদের আদেশ প্রত্যাখ্যান করে নিজের প্রাণদন্ডকেই নিয়তির লিখন জ্ঞানে বরণ করে মীর মর্দান আর মোহনলালের মত ধন্য হতে পারত। সিরাজ যখন একটু অসহায়ের মত বেঁচে থাকার আবেদন করেছিল তখন মুহম্মদী বেগ একথা বলেনি যে, না আমরা তা দেব না। বরং তাঁর ভাষাতে হৃদয়ের অবারিত প্রেমধারাই প্রবাহিত হয়েছিল– 'না, তারা তা দেবে না।' এসব 'তারা' কারা?

যা হোক, সিরাজকে হত্যা করে তাঁর মৃতদেহকে একটি রাস্তায় ভরে হাতির পিঠে চড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সিরাজের স্ত্রী, মা এবং অনেক আত্মীয়া তখন বন্দিনী। তাঁদের জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তাঁরা আলিবর্দীর বিখ্যাত বাগানের আম খেতে চান কি-না। অশ্রু সজল নয়নে তাঁরা ইঙ্গিতে সম্মতিই দিয়েছিলেন। এরপর ইংরেজ কর্মচারীর আদেশ অনুযায়ী অর্ধ ভর্তি আমের বস্তা পৌঁছে দেয়া হয়েছিল এবং নবাব পরিবারের সব মহিলার পক্ষ থেকে একজন বস্তার মুখ খুলতেই দেখতে পেলেন ভিতরে আমও নেই বা অন্য কোন খাদ্যবস্তুও নেই, আছে সিরাজের বীভৎস কাঁচা কাটা মাথা। সিরাজ যেন তাঁর গর্ভধারিণী মাকে শেষ দেখা দেখতে এসেছেন। সিরাজের হতভাগী মা প্রিয় পুত্রের মুখের দিকে এক পলক তাকাতেই অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। সম্বিত ফিরে এলে মীর জাফরের অনুচর গোলাম হোসেনের আদেশে তাঁকে পুনরায় কারারুদ্ধ করা হয়।

এদিকে জয়নুল আবেদীন নামক এক দরিদ্র নাগরিকের অনুরোধে সিরাজের

www.nagorikpathagar.org

খন্ডিত দেহকে ভাগীরথী নদীর পাড়ে খোসবাগ নামক বাগানে নানাজান আলিবর্দীর কবরের পূর্ব পাশে সমাহিত করা হল। আবার নানা ও নাতীর এক ঐতিহাসিক মিলন হল মৃত্যুর পরেও। এ প্রসঙ্গে বর্ধমান জেলার এক কবির কবিতার কিয়দংশ শ্রদ্ধার সাথে তুলে ধরছি–

'আলিবর্দীর কবরের ছায়া সূর্যাস্তের সনে,
ধীরে ধীরে পড়ে সিরাজের গোরে! দেখি ভাবি মনেঃ
আজো বুঝি দাদু ভোলে নাই তারি স্নেহের দুলালটিরে,
আজো বুঝি তারে দুটি বাহু দিয়ে রেখেছে সোহাগে ঘিরে।'

www.nagorikpathagar.org

সিরাজের চরিত্র হননকারী কারা

বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও তাঁর শাসনামল নিয়ে ইংরেজ ঐতিহাসিকরা যে ইতিহাস রচনা করে গেছেন তা উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং মিথ্যায় ভরপুর। উদাহরণস্বরূপ হলওয়েলের নাম করা যায়। ইংরেজ ঐতিহাসিক হলওয়েল ব্ল্যাক হোল বা অন্ধকূপ হত্যা নামক আজগুবি এক কাল্পনিক কাহিনী সাজিয়ে সিরাজ চরিত্রে কলংক আরোপনের অপচেষ্টা করেন। তবে হলওয়েরের মিথ্যাচার যে কোন স্বাভাবিক চিন্তার মানুষের কাছে হাতে নাতে ধরা পড়ে গেলেও হলওয়েলদের এদেশীয় সহচর কতিপয় জ্ঞানপাপী সিরাজ-চরিত্রে কলংক লেপনের অপকর্মে হলওয়েলকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। এ বইয়ের একাংশে হলওয়েলের মিথ্যাচার নিয়ে মোটামুটি আলোচনা হয়েছে। আমরা এ পর্যায়ে তার সহযোগী জোচ্চোরদের চেহারা উন্মোচনের চেষ্টা করবো।

নবীন চন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯) তাঁর 'পলাশী যুদ্ধ' কাব্যে সিরাজকে 'দুর্দ্দান্ত, নিষ্ঠুর পামর' হিসেবে উল্লেখ করেন। সিরাজের পতন ও রণ-চতুর ক্লাইভের জয় গান করাই কবির উদ্দেশ্য।

হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) তাঁর 'ছায়াময়ী' (১৮৮৪) কাব্যে সিরাজকে রোম সম্রাট নীরোর সগোত্র হিসেবে উল্লেখ করে নবাবের চরিত্র-হননে আত্মনিয়োগ করেন। সিরাজকে পাপিষ্ঠ হিসেবে চিহ্নিত করে তিনি লিখেন–

> 'অই পাপী নর আত্মা বিকট আত্মা...
> শুনিলে এখনি তুমি ঢাকিবে শ্রবণ।'

বাংলার কবি হেমচন্দ্র স্বাধীনতার প্রতিভু বাংলার নবাব বাঙালির নবাব সিরাজকে কতটা নির্দয়ভাবে হেয় প্রতিপন্ন করলেন তা ভাবলেও গা শিউড়ে ওঠে!

জন ক্লার্ক মার্শম্যান-এর লেখা 'Outlines of the History of Bengal for the use for youth in India' বইয়ে সিরাজকে দঅ গড়হংঃবৎ ড়ভ ঈৎঁবষঃু হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ইংরেজ লেখক তার স্বজাতির স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে এমন ঢাহা মিথ্যাচার করতেই পারেন। বিশেষত: মিথ্যার বেসাতিই যাদের আজন্ম লক্ষ্য তাদের পক্ষে এ ধরণের মিথ্যাচার অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১) মতো লোক সেই মার্শম্যানকে অনুকরণ করে তাঁর 'বাঙ্গালার ইতিহাস-২য় ভাগ' (১৮৪৮)-এ প্রজাবৎসল, দেশপ্রেমিক, খাঁটি

বাঙালি নবাব সিরাজকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে নেতিবাচক চরিত্রে উপস্থাপন করেন। তিনি সিরাজকে 'নৃশংস রাক্ষস', 'অতি দুরাচার' বলেছেন।

'(ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিদ্যাসাগর রচনাসমগ্র, ১ম খণ্ড, 'বাঙ্গালার ইতিহাস-দ্বিতীয় ভাগ', রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলিকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ২১৯)

যদুনাথ সরকার (১৮৭০-১৯৫৮) বাঙালি ঐতিহাসিক হিসেবে যথেষ্ট নাম কুড়িয়েছেন। কিন্তু দেশপ্রেমিক নবাব সিরাজের ব্যাপারে তাঁর বইয়ে তিনি যা লিখেছেন তাকে ইতিহাস বলা যায় না, বরং তা নবাব সিরাজের উপর চরম আক্রোশ বৈ কিছু নয়। সিরাজ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য–

> 'The character of Siraj-Ud-Daulah was reputed to be one of the worst even known. In fact he had distinguished himself not only by all sorts of debaucheries, but by a revoting cruelty....every one trembled at the name of Siraj-Ud-Daulah.'
>
> *(Jadunath Sarker (ed.), The History of Bengal, voll II, p. 469)*
>
> অর্থাৎ আমাদের জানার পরিধির সবচেয়ে নিকৃষ্টতম চরিত্রের অন্যতম প্রধান নিকৃষ্ট চরিত্র হল সিরাজ। বস্তুত তিনি কেবল সবধরণের কামুকতা ও নেশাগ্রস্ততার জন্যেই বিশেষ কুখ্যাতি অর্জন করেননি, বরং তাঁর মধ্যে ছিল ভয়ংকর নৃশংসতা... সিরাজ-উদ-দৌলার নাম শুনেই সবাই ভয়ে কেঁপে উঠতো।

(যদুনাথ সরকার, বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৯)

ঈশ্বরচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যিক এবং যদুনাথ-রমেশচন্দ্র মজুমদারদের মতো ঐতিহাসিকদের ধারা অনুসরণ করে আরও কতিপয় অর্বাচীন সাহিত্যিক সিরাজকে 'ইন্দ্রিয়পরায়ণ ঘোর বিলাসী', মদ্যপ, নারীলোলুপ, অপদার্থ শাসক হিসেবে চিত্রিত করেছেন।

(শেখ আতাউর রহমান, বাংলা কথাসাহিত্য: মুসলিম চরিত্র, পরিবার ও সমাজ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ১৯৪-৯৯, ২৬১-৬৪)

সিরাজ সম্পর্কে হলওয়েল, মার্শম্যান এবং তাদের ভারতীয় অনুচরদের অভিযোগসমূহ যে সর্বৈব মিথ্যা ও বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত তা বহু আগেই দিবালোকের মতো প্রমাণিত হয়ে গেছে। সিরাজের বিরুদ্ধে প্রথম সুপরিকল্পিত অভিযোগ 'অন্ধকূপ হত্যা'র অসারতা নিয়ে এ বইয়ের অন্যত্র সংক্ষিপ্ত আকারে

www.nagorikpathagar.org

আলোচনা করা হয়েছে। এখন যে কেউ জানেন যে, সিরাজের চরিত্র-হনন করার উদ্দেশ্যেই এত বড় একটা জলজ্যান্ত মিথ্যা অপবাদ সিরাজ-চরিত্রে লেপ্টে দেয়া হয়েছিল-যা ইংরেজদের এদেশীয় দোসররা আরও জোরে-সোরে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু 'অন্ধকূপ হত্যা'র প্রবক্তারা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, আর সিরাজ ঠাঁয় করে নিয়েছেন জনমনে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে। ধর্মের কল যেমন বাতাসে নড়ে, ঠিক তেমনি সিরাজ চরিত্রের প্রকৃত রূপটিও আমাদের কাছে প্রকাশিত হয় অনায়াসেই। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১-১৯৩০) রচিত 'সিরাজদ্দৌলা' (১৮৯৮) ইতিহাস গ্রন্থটি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'অনেক ইংরেজ ঐতিহাসিক ব্রিটিশ শাসকদের মনোরঞ্জনার্থে বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলাকে নির্দয়, উদ্ধত ও স্বেচ্ছাচারী হিসেবে চিত্রিত করে তাঁর চরিত্রের উপর কলংক লেপন করেছেন। নবাব সিরাজদ্দৌলা অন্ধকূপ-হত্যা ঘটিয়েছেন বলে এ-সব ঐতিহাসিক প্রচার চালান। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তাঁর এই গবেষণামূলক গ্রন্থে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে নিষ্কলংক প্রতিপন্ন এবং অন্ধকূপ-হত্যা সম্পূর্ণ অলীক ও অন্ধকূপ-হত্যা আদৌ সংঘটিত হয়নি বলে প্রমাণ করেছেন।'

(সেলিনা হোসেন ও নুরুর ইসলাম সম্পাদিত বাংলা একাডেমি চরিতাভিধান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৭, 'অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়' প্রসঙ্গ, পৃ.২)

ইংরেজ ঐতিহাসিক হলওয়েল তাঁর 'Narrative of the Black Hole' গ্রন্থে নবাব সিরাজউদ্দৌলার নামে এই অন্ধকূপ-হত্যার কলংক প্রচার করেন। কিন্তু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রমাণ করেন যে, অন্ধকূপ-হত্যার মতো কোন ঘটনা আদৌ ঘটেই নি। Calcutta Historical Society কর্তৃক আহুত এ সংক্রান্ত বিচারসভায় প্রদত্ত বক্তৃতায় (Journal of the Historical Society, vol. part 1, Serial No. 23, pp. 156-71-এ বক্তৃতাটি প্রকাশিত) তিনি প্রমাণ করেন যে,

> 'The History of the Black Hole was a gigantic hoax'. অর্থাৎ 'অন্ধকূপ-হত্যা কাহিনী ছিল প্রকান্ড এক ধোঁকা।

(অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, সিরাজদ্দৌলা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, কলকাতা, একাদশ মুদ্রণ, ১৩৬৫ সাল, পরিশিষ্ট, 'অন্ধকূপ কাহিনী প্রসঙ্গ, পৃ. ৩৭১)

অক্ষয়কে অনুসরণ করে পরবর্তীকালে অনেক গবেষক তাঁদের ঐতিহাসিক গবেষণা কাজের মাধ্যমে ইতিহাসের প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন করতে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁরা শ্রমলব্ধ নিরপেক্ষ গবেষণা কাজের মাধ্যমে সিরাজ সম্পর্কে

www.nagorikpathagar.org

ঐতিহাসিক তথ্যাদি আবিষ্কার করেন এবং প্রকৃত সিরাজকে জনসন্মুখে উপস্থাপন করে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেন। তাঁদের মধ্যে যাঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন- নিখিলনাথ রায় (১৮৬৫-১৯৩২), শ্যামধন মুখোপাধ্যায়, Brijen K. Gupta, মুহম্মদ আব্দুর রহিম, সুশীল চৌধুরী প্রমুখ। এ প্রসঙ্গে নিখিলনাথ রায়ের মুর্শিদাবাদ কাহিনী (এন্টনি বাগান লেন, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৭৮), শ্যামধন মুখোপাধ্যায়ের মুর্শিদাবাদের ইতিহাস (Dhuna-Shindoo press, calcutta, 1864), ব্রিজেন কে. গুপ্তের Sirajuddaulah and the East India Company (1756-57), Leidan, E.J. Bril, Netherlands, 1962), মুহম্মদ আব্দুর রহিমের (প্রধান সম্পাদক) বাংলাদেশের ইতিহাস, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, সপ্তম সংস্করণ, ১৯৯৮, সিরাজউদ্দৌলা প্রবন্ধ, পৃ. ৩২৫-৩৪) বিশেষভাবে স্মর্তব্য।

www.nagorikpathagar.org

পলাশী যুদ্ধের ফলাফল

রাজনৈতিক : ভারতের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হলো

পলাশী যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়ে যায়। ১৭৫৭ সালের ২৩ শে জুন পলাশী নাটক মঞ্চস্থের পর এবং ৩ রা জুলাই বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ্দৌলাকে নির্মমভাবে হত্যা করার পর পলাশীর কুশীলব ইংরেজ ও হিন্দু জমিদাররা মিলে অর্বাচীন মীর জাফর আলী খানকে মসনদে বসিয়ে পর্দার আড়ালের শাসক হয়ে বসে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। কয়েক বছর পর তাকে বাদ দিয়ে মীর কাশিমকে ক্ষমতায় বসায়, কিন্তু তিনি এক পর্যায়ে বিদ্রোহ করলে ইংরেজরা তাকে বাদ দিয়ে নিজেরাই সরাসরি ক্ষমতায় বসে। তারা প্রথমে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা দখল করলেও পরবর্তীতে পুরো ভারতবর্ষ দখল করে নেয়। আমাদের জাতীয় কবি যথার্থই লিখেছেন–

> 'এই গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর'।

পলাশী নাটকের মাধ্যমে সাত সমুদ্দুর তের নদীর ওপার থেকে আসা ইংরেজ বেনিয়ারা ভারত বর্ষের দন্ড-মুন্ডের কর্তা হয়ে বসে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছিল স্রেফ একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু ভারতবর্ষের মতো হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী, সমৃদ্ধ ও পুরনো সভ্যতার পাদভূমি একটি ভূ-খণ্ড প্রায় ১০০ বছর শাসিত হ'ল একটি কোম্পানির দ্বারা এবং পরবর্তী ৯০ বছর সরাসরি শাসিত হয়েছে ব্রিটিশ ক্রাউন দ্বারা। একটি কোম্পানির কয়েকজন বেনিয়া ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব হরণ করে নিল, আর পুরো ভারতবাসী তা চেয়ে চেয়ে দেখল! হায় রে ভারত! হায় রে তার মিথ্যে জাত্যাভিমান!

www.nagorikpathagar.org

অর্থনৈতিক

১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বার্ষিক মাত্র ৩০০০ টাকা শুল্ক প্রদানের বিনিময়ে বাংলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করে। বাংলার সেই সময়ের সুবাদার শাহ সুজা কোম্পানিকে প্রথমে না শুল্কে বাণিজ্য করতে দেয়। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে মোগল সম্রাট ফররুখশিয়ার এক ফরমান বলে কোম্পানিকে দ্বিতীয় বার এ সুবিধা প্রদান করে। এভাবে কোম্পানি বাংলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্য করতে থাকে।

বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোম্পানি প্রথমে যে নীতি গ্রহণ করে তাকে 'দাদনি' ব্যবস্থা বলা হয়। ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ১০০ বছর এ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কলকাতার ব্যবসায়ীদের সাথে কোম্পানি নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত পরিমাণ পণ্য সরবরাহের চুক্তি করত এবং এ বাবদ কোম্পানি ব্যবসায়ীদেরকে দাদন বা অগ্রীম অর্থ প্রদান করত। কোম্পানির সাথে ব্যবসায়িক চুক্তি আবদ্ধ এসব ব্যবসায়ীর মধ্যে অন্যতম ছিলেন-গোপীনাথ শেঠ, রামকৃষ্ণ শেঠ, লক্ষীকান্ত শেঠ ও শুভরাম বসাক। শেঠ-ইংরেজ মিলে এই যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি করে তা পরবর্তীকালে পলাশী ট্র্যাজেডির বীজ বপন করেছিল। দাদন ব্যবসার অন্তরালে কোম্পানি এবং শেঠ ব্যবসায়ীরা মিলে স্থানীয় কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উপর সীমাহীন নির্যাতন করত। ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দে দাদনি ব্যবসায় কোম্পানির বিনিয়োগ ছিল ৩০ লক্ষ টাকা; ১৭৫১-৫২ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৪ লক্ষ টাকায়। এ ব্যবসায়ের অন্তরালে কোম্পানি তাঁতিদের সাথে মারাত্মক দুর্ব্যবহার করত এবং বাজার দরের তুলনায় তাদেরকে শতকরা ২০ থেকে ৩০ টাকা কম দেয়া হত। এসব কারণে তাঁতীরা কোম্পানির সাথে ব্যবসা না করে ফরাসি ও অন্যদের সাথে ব্যবসা করতে আগ্রহী ছিল। ফলে কোম্পানি তার ব্যবসায়ের কৌশল বদল করে। ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি দাদনি ব্যবসার পরিবর্তে এজেন্সি ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এজেন্সী ব্যবস্থার কাঠামো ছিল এ রকম–

বেতনভোগী একজন ইংরেজ রেসিডেন্টের দায়িত্বে একেকটি আড়ং থাকত। রেসিডেন্টের অধীনে থাকত বেতনভোগী গোমস্তা। গোমস্তার অধীনে থাকত মোহরি, সেরেস্তাদার, যাচনাদার, মুকিম, তাগিদদার, বরকন্দাজ, পিয়ন ইত্যাদি। এজেন্সী ব্যবস্থাতেও পূর্বের দাদন ব্যবস্থার মত তাঁতীদের সাথে কোম্পানীর চুক্তি হত, তাঁতীদেরকে দাদন দেয়া হত এবং শর্তানুযায়ী তাঁতীরা

কোম্পানীকে বস্ত্র সরবরাহ করত। এ ব্যবস্থার অন্তরালেও ইংরেজরা তাঁতীদের উপর মারাত্মক জুলুম-নির্যাতন করত। কোম্পানীর কর্মকর্তা উইলিয়াম বিল্টস এর বর্ণনা থেকে জানা যায়–

"গোমস্তা তাঁতীদের দাদন দিত। দরিদ্র হতভাগ্য তাঁতীদের স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতির কোন তোয়াক্কা তারা করতো না। তাঁতীরা দাদন নিতে না চাইলে তাদের কোমরে টাকা গুঁজে দিয়ে বেত্রাঘাত করা হতো। গুদামজাত করার পর যাচনাদার দ্বারা মালামাল যাচাই করা হতো। অনেক ক্ষেত্রে যাচনাদার 'ক' শ্রেণীর পণ্য 'খ' শ্রেণীর পণ্যে পরিণত করতো। ফলে তাঁতীরা কম মূল্য পেতো।"

(বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস, ড. এম. ওয়াজেদ আলী, পৃ.১২)

পলাশী ট্রাজেডির পর এজেন্সি ব্যবস্থা তাঁতীদের জন্যে আরও ক্ষতির কারণ হয়। পলাশীর পর কোম্পানীর কর্মচারীরা এদেশবাসীর দন্ডমুন্ডের কর্তা হিসেবে আবির্ভুত হয় এবং স্থানীয় তাঁতীদের সাথে যাচ্ছেতাই ব্যবহার করতে লাগল। বাজার দরের চেয়ে তারা তাঁতীদের শতকরা ২০ থেকে ৩০ টাকা পর্যন্ত কম মূল্য তো দিতই, উপরন্তু কোন তাঁতী যেন কোম্পানী ব্যতীত অন্য কারও সাথে ব্যবসা করতে না পারে সেজন্যে তারা কোম্পানী আইন প্রবর্তন করল। ফলে তাঁতীরা তাদের স্বাধীনতা হারাল।

এজেন্সি ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে কোম্পানীর কর্মকর্তা কর্মচারীরা ব্যক্তিগত ব্যবসায় লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং স্থানীয়দের উপর নানাভাবে অত্যাচার-উৎপীড়ন চালাতে থাকে। পলাশী যুদ্ধের পর কোম্পানীর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তৃতির পাশাপাশি কোম্পানীর নিজস্ব ব্যবসা কতটা বিস্তৃত হয়েছিল তা এক এজেন্সি ব্যবসার তথ্য থেকেই খানিকটি ধারণা করা যায়। ১৭৫১-১৭৫২ সালে যেখানে কোম্পানীর বিনিয়োগ ছিল ৩৪ লক্ষ টাকা, ১৭৯৩ সালে তা এসে দাঁড়ায় ১ কোটি ৯ লক্ষ টাকা।

কোম্পানী বিনা শুল্কে ব্যবসা করত। অপরদিকে শুল্ক দিয়ে ব্যবসা করার কারণে বাঙালী ব্যবসায়ীরা প্রতিযোগিতায় তাদের সাথে কুলিয়ে উঠতে পারত না।

পলাশী যুদ্ধ বাংলার মুদ্রা ব্যবস্থাকে সংকটে ফেলে। এর আগে কোম্পানী ইংল্যান্ড থেকে রূপার বাট নিয়ে আসতো এবং নবাবের টাঁকশালে তা গলিয়ে টাকা টংকন করতো। কিন্তু পলাশী যুদ্ধ ও বিশেষত ১৭৬৫ সালে কোম্পানী কর্তৃক দেওয়ানী লাভের পরে কোম্পানীর মূলধন বাংলা থেকে সংগৃহীত হবার ফলে কোম্পানী ইংল্যান্ড থেকে রূপার বাঁট আনা বন্ধ করে দেয়। বাংলায় রূপার

www.nagorikpathagar.org

বাঁট না আনা এবং নানা উপায়ে সম্পদ পাচারের কারণে মারাত্মক মুদ্রা সংকট দেখা দেয়।

রেশম সুতা প্রস্তুতকারকদের জন্যে পলাশী ভয়াবহ দুঃখ বয়ে নিয়ে আসে। কোম্পানীর নির্দেশ মত সুতা প্রস্তুত না করলে তাঁতীদের হাতের আঙুল কেটে নেয়া হত। নানা অপকৌশল ও অপকর্মের মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলার বস্ত্র শিল্পকে ধ্বংস করে; অপর প্রান্তে ইংল্যান্ড সূচনা করে শিল্প বিপ্লবের। এ যেন 'তোমার হল শুরু, আমার হল সারা'। নবাবী আমলে কৃষির পাশাপাশি বাংলার বস্ত্র শিল্পের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। তাঁতীরা স্বাধীনভাবে বস্ত্র তৈরি করতো এবং স্বাধীনভাবে তা বাজারজাত করত। ইস্ট ইন্ডিয়ার কোম্পানী তাঁতীদের সবকিছু হরণ করে নেয়। পলাশী-পূর্ব বাংলার তাঁতশিল্পের স্বর্ণযুগ এবং পলাশী-উত্তর এর অবস্থা সম্পর্কে ড. এম. ওয়াজেদ আলী লিখেছেন–

'অষ্টাদশ শতাব্দীতে বস্ত্রশিল্প বাংলার অর্থনীতির প্রধান অঙ্গ ছিল। বাংলার অর্থনীতিতে কৃষির পরে স্থান ছিল বস্ত্রশিল্পের। তাঁতীরা বিদেশে রফতানির জন্য মিহি কাপড় তৈরি করতো। মিহি কাপড়কে বলা হতো মসলিন কাপড়। তাঁতীরা নিম্নলিখিত মসলিন কাপড় তৈরি করতো–

১. মলমল (চিকন মসলিন), ২. তানজিব (শরীরের অলংকার), ৩. আবরোয়ান (খরস্রোতা নদীর পানির মত স্বচ্ছ), ৪. আল্লাবালি (অতি সূক্ষ্ম মসলিন), ৫. নয়নসুক (মোটা মসলিন), ৬. বদন খাস (মিহি মসলিন), ৭. সরবতী (সরবতের মত অর্ধ-স্বচ্ছ), ৮. তেরিনডাম (মসলিন), ৯. সরকার আলী (নবাবের দরবারের জন্য প্রস্তুত মসলিন), ১০. জামদানি (কারুকার্য খচিত মসলিন শাড়ি), ১১. হাম্মাম মোটা মজবুত সুতার বস্ত্র), ১৪. জঙ্গল খাসা (একে বিকেলের শিশির বলা হতো), ১৫. ঝুনা (জালের মত স্বচ্ছ মসলিন কাপড়; সাধারণত নর্তকীরা ব্যবহার করতো), ১৬. রঙ্গ (ঝুনার মত স্বচ্ছ), ১৭. বাফতা, সান্নু ও গুরারহ মোটা ধরনের মসলিন) ও ১৮. অমৃতি ও চিনটন মোটা ধরনের নক্সা করা কাপড়)। এ ছাড়াও মুক্তা, মুগা, নোয়ানি, লাহি প্রভৃতি নামের শাড়ি প্রস্তুত হতো।

উপরিউক্ত বস্ত্র ছাড়া তাঁতীরা ঢাকা মসলিন নামে এক ধরনের অতি মিহি কাপড় তৈরি করতো। বিদেশী রাজদরবার ও অভিজাত পরিবারে এর প্রচুর চাহিদা ছিল। দেশীয় নবাব, সভাসদ ও সেনা প্রধানের পরিবারেও কাপড় ব্যবহৃত হতো। এক খন্ড (২০ গজ দৈর্ঘ্য ও ১ গজ প্রস্থ) ঢাকা মসলিন প্রস্তুত করতে একজন তাঁতীর ছয় মাস সময় লাগতো এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য সময়ে এর

www.nagorikpathagar.org

দাম ছিল ৭৭৫/- টাকা। অর্ডার ছাড়া ও কাপড় তৈরি হতো না। ঢাকা মসলিন এত সূক্ষ্ম ছিল যে মি. মুখার্জির মতে এক খন্ড (২০ গজ দৈর্ঘ্য ও ১ গজ প্রস্থ) কাপড়কে একটি আংটির মধ্য দিয়ে নেয়া যেত। নবাবী আমলে বস্ত্রশিল্পের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। তাঁতীরা স্বাধীনভাবে বস্ত্র তৈরি করতো এবং ইচ্ছামত যে কোন খোলা বাজারে বিক্রি করতো। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর উইলিয়াম বল্টস নামক একজন কর্মচারী বলেন যে তাঁতীরা তাদের নিজের মূলধন নিয়োগ করতো এবং ইচ্ছামত কাপড় বাজারজাত করতো। প্রমাণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন যে ইউরোপীয় ক্রেতারা ঢাকা বিক্রয় কেন্দ্রে সকালের মধ্যেই ৮০০ খানা বস্ত্র ক্রয় করতো।

১৭৫৩ সালে এজেন্সি ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর এবং বিশেষ করে পলাশী যুদ্ধের পর বস্ত্র শিল্প ক্ষতির সম্মখীন হয়। পলাশী তাঁতীদের জন্য দুঃখ বয়ে আনে। পলাশী যুদ্ধের পর থেকে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তাঁতীদের নিয়ন্ত্রণ করার নীতি গ্রহণ করে। উইলিয়াম বল্টস বলেন যে, তাঁতীরা কোম্পানীর জন্য বস্ত্র প্রস্তুত করার নিমিত্তে দাদন গ্রহণ না করলে দাদনের টাকা তাদের কোমরে গুঁজে দিয়ে বেত্রাঘাত করা হতো। অর্থাৎ কোম্পানীর কর্মচারীরা কোম্পানীর জন্য কাপড় প্রস্তুত করতে তাঁতীদের বাধ্য করতো। তারা তাঁতীদের বাজার দর থেকে শতকরা ২০ থেকে ৩০ টাকা কম দিতো। ফলে চুক্তিবদ্ধ হয়েও তাঁতীরা কোম্পানির কর্মচারীদের নিকট কাপড় সরবরাহ না করে ফরাসি, ওলন্দাজ ও ড্যানিশ কোম্পানীর নিকট বিক্রি করতো। বাংলায় অন্যান্য কোম্পানীর উপস্থিতি তাঁতীদের রক্ষাকবজ হয়ে দাঁড়ায়। তাদের কৃতদাসে পরিণত করতো।

১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষ তাঁত শিল্পের উপর প্রভাব ফেলে। দুর্ভিক্ষে বহু সুতা প্রস্তুতকারক ও তাঁতী মৃত্যু মুখে পতিত হয়। ফলে সুতার মূল্য বৃদ্ধি পায়। দুর্ভিক্ষের পূর্বে এক সের মোটা সুতার মূল্য ছিল ২ টাকা ৮ আনা ও চিকন সুতার মূল্য ছিল ৪ টাকা ৬ আনা। দুর্ভিক্ষের পরে এক সের মোটা সুতার মূল্য বৃদ্ধি হলেও কোম্পানী বাজার দর থেকে শতকরা ২০ থেকে ৩০ টাকা কম দেয়। ফলে তাঁতীরা কোম্পানির জন্য কাজ করতে অনীহা প্রকাশ করে।

তাঁতীদের নিয়ন্ত্রন করার জন্য ব্যবসায়ী ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। ফলে ১৭৮৬ সালের ১ শে জুলাই ২১টি ধারা সম্বলিত একটি আইন পাস করা হয়। নিম্নে এ আইনের কয়েকটি ধারা উল্লেখ করা হলো।

ক. যে সব তাঁতী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে কাপড় সরবরাহের জন্য চুক্তিবন্ধ হবে

www.nagorikpathagar.org

তাদের টিকেট দেয়া হবে। এতে তাঁতীর নাম, ঠিকানা, কাপড়ের পরিমান ও মূল্য লিপিবদ্ধ থাকবে।

খ. কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ তাঁতীদের নাম ও ঠিকানাসহ তালিকাসহ তালিকা পরগণার কাচারিতে রাখতে হবে।

গ. কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ তাঁতী যাতে অন্য ইউরোপীয় কোম্পানির নিকট কাপড় সরবরাহ করতে না পারে সে জন্য তার বাড়ীতে পিয়ন রাখা হবে।

ঘ. যদি কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ তাঁতী অন্য কোম্পানীকে কাপড় সরবরাহ করে তবে তাকে আদালতের রায় অনুযায়ী শাস্তি দেয়া যাবে।

ঙ. যদি কোম্পানির কর্মচারীরা তাঁতীদের কম মূল্য প্রদান করে তবে তারা রেসিডেন্টের কাছে আবেদন করতে পারবে।

১৮৮৭ সালে আরও একটি আইন পাস করা হয়। এ আইনের কিছু ধারা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

ক. কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ কোন তাঁতী যদি অগ্রীম নিতে অনিচ্ছুক হয় তবে তাকে ১৫ দিন পূর্বে নোটিশ দিতে হবে।

খ. কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ কোন তাঁতী যদি চুক্তি অনুযায়ী কাপড় সরবরাহ করতে অপারগ হয় তবে সমস্ত কাপড় সরবরাহ না করা পর্যন্ত সে অন্য কোন কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করতে পারবে না।

গ. কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ কোন তাঁতী যদি কাপড় সরবরাহ করতে না পারে এবং চুক্তি থেকে অব্যাহতি চায় তবে তাকে শতকরা ৩৫ টাকা হারে সুদ দিয়ে সুদ আসল পরিশোধ করতে হবে।

উপরিউক্ত আইন দ্বারা কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ তাঁতীদের নিয়ন্ত্রণ করা হয়। চুক্তিবদ্ধ তাঁতীরা কোম্পানির জন্য কাজ করতে বাধ্য থাকায় তারা তাদের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা হারায়।'

(বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস, পৃ. ১৪-১৬)

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, পলাশী বিপর্যয়ের পর ইংরেজদের কূটকৌশলে বাংলার বস্ত্র শিল্প কালক্রমে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। মুঘল ও নবাবী আমলে বাংলা থেকে ইংল্যান্ডে বস্ত্র রফতানি হত। অথচ ১৭৯০ সালের শেষের দিক থেকে বাংলা থেকে ইংল্যান্ড এ বস্ত্র রফতানি বন্ধ হয়ে যায়।

আর উনবিংশ শতাব্দীর শেষ হতে উল্টে ইংল্যান্ড থেকে বাংলায় বস্ত্র আমদানি হতে থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পলাশী ট্রাজেডির পূর্বে যেখানে আমরা ছিলাম বস্ত্র রফতানিকারক, সেখানে আমরা পলাশীর পর হয়ে গেলাম বস্ত্র আমদানি কারক। প্রসঙ্গতে ঢাকাই মসলিনের কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। বাংলার তাঁতীরা মুঘল ও নবাবী আমলে অর্থাৎ মুসলিম শাসনামলে ইতোপূর্বে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের মসলিন ছাড়াও বিশেষ এক ধরনের মসলিন তৈরি করত যা ঢাকা মসলিন নামে পরিচিত ছিল। এটি ছিল এক ধরনের অতি মিহি কাপড় যা দৈর্ঘ্যে ২০ গজ ও প্রস্থে ১ গজ হত। মৈঃ মুখার্জীর মতে এমন একটি শাড়ীকে একটি আংটির ভেতর দিয়ে সহজেই নেয়া যেতো। (ডি. আর গ্যাড গিল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইভোলিউশন ইন ইন্ডিয়া, ৫, সংস্করণ, পৃ. ৩৪)। এমন শৈল্পিক ও উন্নতমানের একটি কাপড় তৈরি করতে একজন তাঁতীর ৬ মাস সময় লাগত। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এমন একখন্ড শাড়ির দাম ছিল ৭৭৫ টাকা। অর্ডার ছাড়া তা তৈরি করা হতো না। দেশীয় নবাব, সভাসদ ও সেনা প্রধানের পরিবার এবং বিদেশী রাজদরবার ও অভিজাত পরিবারের মধ্যে এ কাপড়ের চাহিদা ছিল। কিন্তু ইংরেজ কর্তৃক ক্ষমতা দখলের পর নবাবদের অনেকেই তাদের হাতে নিহত হয় এবং নবাব পরিবার। অন্য অভিজাত পরিবারসমূহ হত দরিদ্র হয়ে পড়ে। বন্ধ হয়ে যায় বিদেশে ও বস্ত্র রফতানি। ফলে বিলুপ্ত হয়ে পড়ে ঢাকা মসলিন।

www.nagorikpathagar.org

বাংলা থেকে সম্পদ নিঃসরণ

সম্পদ নিঃসরণ মানে হল এক দেশ থেকে অন্য দেশে সম্পদ নিয়ে যাওয়া এবং বিনিময়ে কোন সম্পদ না আনা। পলাশী ট্রাজেডির পর বাংলা থেকে ইংল্যান্ডে সম্পদ নিঃসরণের হরিলুট চলতে থাকে। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা নানা পন্থায় সম্পদ আহরণ করে সেই আহরিত সম্পদ ইংল্যান্ডে পাচার করতে থাকে। আর ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী নিজেও বাংলা থেকে ইংল্যান্ডে নিঃসরণ করতে থাকে। সম্পদ নিঃসরণের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র নিম্নে উদ্বৃত হল–

পলাশী লুণ্ঠন

মুসলিম ভারতে ইংরেজরাই প্রথম ঘুষ-বাণিজ্য আরম্ভ করে। পলাশী ট্র্যাজেডির পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা নবাব, যুবরাজ, অভিজাত সম্প্রদায়ের সদস্য ও ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে চাপ প্রয়োগ করে অবৈধভাবে ঘুষ, নজরানা বা উপহার হিসাবে বিপুল পরিমাণ অর্থ সম্পদ গ্রহণ করতে থাকে। পলাশী প্রহসনের ইংরেজ বাহিনীর প্রধান রবার্ট ক্লাইভ প্রথমে এই অপকর্ম আরম্ভ করেন। কোম্পানীর অন্যান্য কর্মচারীরাও তাকে অনুসরণ করে অবৈধ পন্থায় সম্পদ আহরণ করে তা বাংলা থেকে নিঃসরণ করতে থাকে।

১৭৫৭ সালের ২৩ শে জুন পলাশী নাটকের সফল সঞ্চয়নের পর বাংলার শত্রুরা তাদের পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের নজরানা ও উপহার হিসাবে প্রচুর অর্থ দেয় ইতিহাসে যা 'পলাশী লুণ্ঠন' নামে পরিচিতি পেয়েছে। পলাশী যুদ্ধে ইংরেজরা একদিকে রাজ্য জড় করে, অপর দিকে বাংলা শত্রু জগৎশেঠ, মীরজাফর, রাজবল্লভ, রায় দুর্লভদের মাধ্যমে বাংলার জনগনের তহবিল থেকে বিপুল পরিমান নগদ অর্থও হাতিয়ে নেয়। নবাব সিরাজ উদ দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত ও মীরজাফরকে সিংহাসনে বসানোর বিনিময়ে কোম্পানীর কর্মচারীরা সরকারী তহবিল থেকে ১২,৩৮,৫৭৫ পাউন্ড উপহারের নাম করে হাতিয়ে নিয়োছিল। এর বাইরেও কোম্পানীর কর্মচারীরা মীরজাফরের

www.nagorikpathagar.org

নিকট থেকে প্রচুর অর্থ নেয়া অব্যাহত রাখে। কিন্তু মীরজাফর লোভী, তস্কর ইংরেজ বেনিয়াদের অব্যাহত সীমাহীন অর্থ চাহিদা এ পর্যায়ে মেটাতে ব্যর্থ হওয়ায় তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে ১৭৬০ সালে মীরকাসিমকে সিংহাসনে বসায়। সিংহাসনে আরোহন করে মীরকাসিম ইংরেজদের প্রচুর অর্থ প্রদান করেন। মীর কাসিম এক পর্যায়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, কিন্তু ১৭৬৩ সালে বক্সারের তৃতীয় ইংরেজদের নিকট মীরকাসিম পরাজিত হলে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য পুনরুদ্ধারের শেষ সম্ভবনাটি তিরোহিত হয়ে পড়ে। মীর কাসিমকে পরাজিত করে ইংরেজরা আবার মীরজাফরকে ক্ষমতায় বসায়। মীরজাফর এবারও ইংরেজদের প্রচুর অর্থ প্রদান করতে বাধ্য হয়। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে মীরজাফরের মৃত্যুর পর ইংরেজরা তার পুত্র নাজমদ্দৌলাকে সিংহাসনে বসায়। তার নিকট থেকেও ইংরেজরা প্রচুর অর্থ ঘুষ নেয়।

এক হিসাব থেকে জানা যায়, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা কেবল ঘুষ নজরানা বাবদ ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৬ পর্যন্ত পাঁচ কোটি টাকা আয় করে। এ পরিমান টাকা নেয়ার রেকর্ড আছে। (বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস, পৃ. ১৮) সংগত কারনেই ধারণা করা যায় যে, কোম্পানীর কর্মচারীরা এর বাইরেও প্রচুর অর্থ নিয়েছে যা কোন হিসাব নেই। গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের সদস্য ক্লেভারিং, মুনসুন ও ফ্রাননিস অভিযোগ করেছিলেন যে, ওয়ারেন হেষ্টিংস নিজে মাত্র আড়াই বছরে চল্লিশ লক্ষ টাকা ঘুষ নিয়েছিলেন। বারওয়েল নামে একজন ইংরেজ কর্মচারী এ প্রক্রিয়ায় ৮০ লক্ষ টাকা আদায় করেছিলেন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা ঘুষ উপহার ছাড়াও ব্যাক্তিগত ব্যবসায়ের মাধ্যমেও অর্থ উপার্জন করত এবং নিজ দেশে তা পাঠিয়ে দিত। এভাবে বাংলা থেকে সম্পদ নিঃসরিত হয় ১৭৫৭ থেকে ১৭৭৭ খ্রি. পর্যন্ত কোম্পানী কর্মচারীদের ব্যাক্তিগত ব্যবসা চালু ছিল। তবে ব্যক্তিগত ব্যবসা থেকে কোম্পানী কর্মচারীরা কি পরিমাণ অর্থ উপার্জন করেছে এবং বাংলা থেকে নিঃসরন করেছে তার কোন তথ্য এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে দু'একজন কর্মচারীর উপার্জন থেকে এ বিষয়ে কিছুটা ধারণা লাভ করা যায়। মুর্শিদাবাদ দরবারের রেজিডেন্ট সাইকেস মাত্র দু'বছরে ১২-১৩ লক্ষ উপার্জন করেন। প্রত্যেক কর্মচারী বছরে গড়ে ৫ লক্ষ টাকা আয় করলেও ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৮ (১৭৬৮ এর পর ব্যাক্তিগত ব্যবসায়ের পরিমাণ কমে আসে) পর্যন্ত বার বছরে কোম্পানীর চুক্তিবদ্ধ ২৫২ জন কর্মচারীর মোট দাঁড়ায় ১৫ কোটি ১২ লক্ষ টাকা এবং তা বাংলা থেকে যথারীতি নিঃসরিত হয় বলে ধারণা করা যায়। প্রসঙ্গত আরেকটি কথা বলে রাখা আবশ্যক। কোম্পানী এবং কোম্পানীর কর্মচারীরা বিনাশুল্কে

www.nagorikpathagar.org

ব্যাখ্যা করত বিধায় তাদের সালে বাঙালী ব্যবসায়ীরা সাংঘাতিকরকম ক্ষতিগ্রস্ত হয় বেং অভ্যন্তরীণ বাজার থেকে কার্যত তারা উৎখাত হয়।

প্রতারণামূলক ঠিকাদারী ব্যবসার মাধ্যমে হোস্টিংসের আমলে কোম্পানী কর্মচারীরা প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। এ ঠিকাদারীর একটি উদাহরণ দিতে গিয়ে কার্ল মার্কস লিখেন– "এমন অবস্থায় তার (হেষ্টিংসের) প্রিয়জনকে ঠিকাদারি দেয়া হয়েছিল তাতে তারা রসায়নবিদের মত শূন্য থেকে স্বর্ণ তৈরি করতো। একই দিনে প্রচুর অর্থ আয় হতো; এক শিলিং অগ্রিম দিতে হতো না। ৪০ হাজার পাউন্ডে সুলিভান বিনকে ঠিকাদারি বিক্রি করে, একই দিনে ৬০ হাজার পাউন্ডে বিন এটি বিক্রি করে এবং শেষ ক্রেতাও অনেক লাভ করে।"

(বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস, পৃ.১৯)

প্রতারণামূলক ঠিকাদারীর মাধ্যমে কোম্পানী কর্মচারীরা প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। এদের অর্থ উপার্জনের আরেকটি মাধ্যম ছিল বাংলার গরীব অসহায় তাঁতীদের নিকট থেকে 'উপরি' আদায়।

এ প্রসঙ্গে ড. এম ওয়াজেদ আলী লিখেছেন– 'কোম্পানির বিনিয়োগের জন্য বিভিন্ন বিক্রয় কেন্দ্রে নিয়োজিত চীফ অথবা রেসিডেন্ট তাঁতীদের নিকট হতে উপরি পাওনা আদায় করতো। অর্থ উপার্জনের এ পন্থা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য নেই; বোর্ড অব ট্রেড এর কাগজপত্রে ঢাকার লক্ষ্মীপুর বিক্রয় কেন্দ্রের কিছু তথ্য আছে। ভেরেলষ্ট যখন ঢাকার চীফ তখন সে তার নিজের জন্য উপরি পাওনা চাইতো না, তবে ভারতীয় মধ্যস্বত্বভোগীদের জন্য সে টাকায় ১৬ গন্ডা আদায় করতো (২০ গন্ডা =১ আনা; ১৬ আনা =১ টাকা)। রামবন্ডের চীফশিপের সময় সে তার নিজের জন্য টাকায় ৫ ঘন্ডা আদায় করতো এবং পরবর্তীকালে রেসিডেন্ট হিসেবে উইলকিনস একই হারে উপরি পাওনা দাবি করতো। বার্টনের উইলকিনস এর স্থলাভিষিক্ত হয়। সে টাকায় ৭ গন্ডা আদায় করতো। বার্টনের সময় থেকে চীফ ও ভারতীয় মধ্যস্বত্বভোগীরা তাঁতীদের নিকট হতে টাকায় সোয়া এক আনা আদায় করতো। এ পন্থা থেকে আদায়কৃত মোট অর্থের পরিমাণ আমাদের জানা নেই। তবে এর পরিমাণ যে খুব কম হবে তা মনে হয় না।'

(বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস, পৃ. ১৯)

বাংলা থেকে ইংরেজ কর্তৃক সম্পদ নিঃসরণের আরও কয়েকটি চিত্র ছিল এরকম–

'কোম্পানির কর্মচারীগণ হীরকখন্ডে সম্পদ দেশে পাঠাতে পারতো। বাংলায় হীরার খনি ছিল না। হীরক খন্ড উত্তর ভারত থেকে আনতে হতো। ফলে হীরক খন্ড ক্রয়ের মাধ্যমে বাংলা থেকে সম্পদ নিঃসরিত হতো।

কোম্পানির কর্মচারীরা বিনিয়োগ বিলের মাধ্যমে অর্থ দেশে পাঠাতে পারতো। তারা ফরাসি, ওলন্দাজ ও ড্যানিশ কোম্পানিকে টাকা দিতো ও বিনিয়োগ বিল নিতো। কর্মচারীরা ইংল্যান্ড বসবাসরত তাদের আত্মীয়-স্বজনের নিকট বিনিয়োগ বিল পাঠাতো। এর বলে তারা উপরিউক্ত কোম্পানির ইংল্যান্ডের অফিস হতে টাকা উঠাতো। ফরাসি, ওলন্দাজ ও ড্যানিশ কোম্পানি বাংলায় ক্রয়কৃত সম্পদ ইউরোপে পাঠাতো। বিনিময়ে বাংলায় কিছুই আনতো না।

কোম্পানির জাহাজের কমান্ডার ও অফিসারের মাধ্যমে সম্পদ পাঠানো যেতো। কোম্পানি জাহাজের প্রতি কমান্ডার ও অফিসারকে ৫০ টন করে বস্ত্র পাঠানোর অনুমতি দিয়েছিল। কোম্পানির কর্মচারীরা কোম্পানির জাহাজের কমান্ডার ও অফিসারের মাধ্যমে দেশে সম্পদ পাঠাতো।

বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি তাদের রাজস্ব থেকে প্রশাসন চালাতে পারতো না। উক্ত প্রশাসনকে সাহায্য করার জন্য বাংলা থেকে অর্থ যোগান দেয়া হতো। এ প্রক্রিয়ায় বাংলা থেকে সম্পদ নিঃসরিত হয়।

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চীন দেশে ব্যবসা করতো। এ ব্যবসার জন্য কোম্পানির কোন পৃথক তহবিল ছিল না। চীনের ব্যবসার জন্য বাংলা থেকে অর্থ বরাদ্দ করা হতো। চীনের ব্যবসার মাধ্য থেকে ইউরোপে সম্পদ নিঃসরিত হয়।

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা থেকে সুতিবস্ত্র, রেশম সুতা, কাঁচা রেশম ও রেশমবস্ত্র এবং সোড়া ইংল্যান্ডে নিয়ে যেতো। কোম্পানি বাংলার অর্থ দিয়ে এ ব্যবসা করতো। ১৭৫১-৫২ সালে কোম্পানির বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল প্রায় ৩৪ লক্ষ টাকা। ১৭৯৩ সালে এর পরিমাণ প্রায় ১ কোটি ৯ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়। এ অর্থ দ্বারা ক্রয়কৃত সমুদয় সম্পদ ইংল্যান্ডে নিঃসরিত হতো।

রাজস্ব সমপদ নিঃসরনের একটি পথ। ১৭৫৭ সাল থেকে ১৭৭১ সাল পর্যন্ত রাজস্বের বাৎসরিক গড় পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসন পরিচালনার জন্য বাৎসরিক গড় খরচ হতো ৯০ লক্ষ টাকা। বৎসরিক গড় উদ্বৃত ছিল ৪০ লক্ষ টাকা। সমুদয় উদ্বৃত্ত অর্থ ইংল্যান্ডে পাঠানো হতে। তবে এ খাতে সম্পদ নিঃসরনের পরিমাণ আরো বেশি ছিল। কারণ সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীরা তাদের বেতনের সমুদয় অর্থ বাংলায় খরচ

www.nagorikpathagar.org

করতো না, কিছু অংশ দেশে পাঠাতো।

আমদানি-রপ্তানি সম্পদ নিঃসরণের আর একটি পথ। ১৭৬৬ সাল হতে ১৭৬৮ সাল পর্যন্ত বাংলায় আমদানি দ্রব্যের মূল্য ছিল ৬ লক্ষ পাউন্ড এবং বাংলা থেকে রফতানি দ্রব্যের মূল্য ছিল ৬০ লক্ষ পাউন্ড। অর্থাৎ বাংলার আমদানি থেকে রফতানি ছিল নয় গুণ বেশি।

"মুক্ত ব্যবসায়ী" নামক কিছু ব্যবসায়ীকে বাংলায় ব্যবসা করতে ইংল্যান্ডের শাসক অনুমতি দিয়েছিল। ব্যবসার জন্য তাদের কোন অফিস বা কর্মচারী ছিল না। তারা নিজেরাই দ্রব্য কেনা-বেচা করতো। তারা তাদের লাভ ইংল্যান্ডে পাঠাতো। এদের মাধ্যমে সম্পদ নিঃসরিত হতো।'

(বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস, পৃ .১৯-২০)

www.nagorikpathagar.org

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর : পলাশী ট্র্যাজেডির কাল অধ্যায়

পলাশী-উত্তর বাংলা থেকে সম্পদ নি:সরণের মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় যে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে তার অনিবার্য ফলশ্রুতিতে ১১৭৬ বঙ্গাব্দে (১৭৭০ খ্রিস্টাব্দ) পুরো বাংলা জুড়ে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। খাবারের অভাবে সেই সময় বাংলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুবরণ করে। 'ধন-ধান্যে পুস্পে ভরা বাংলায় খাদ্যাভাব কোন দিনও ছিল না। মুসলিম শাসনামলে তো বাংলা তথা গোটা ভারতবর্ষ সকল দিক থেকেই উন্নয়নের এমন শিখরে উপনীত হয়েছিল যে, বাদ বাকী বিশ্বের নিকট তা ছিল রীতিমতো ঈর্ষার কারণ। অথচ বাংলার স্বাধীনতা হরণের মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই ইংরেজ বেনিয়া এবং তাদের এদেশীয় দোসরদের অন্যায়-অত্যাচারের মাধ্যমে বাংলার চেহারা এতটাই বিবর্ণ হয়ে যায় যে, নিতান্ত খাদ্যের অভাবে বাংলার অধিকাংশ বনি আদমকে মৃত্যুর পেয়ালা পান করতে হয়েছিল।

সুতরাং সামগ্রিক বিচারে দেখা যায় যে, পলাশী বিপর্যয়ের পর ইংরেজরা বাংলায় ভয়াবহ আর্থিক লুণ্ঠন চালাতে থাকে এবং এদের লুঠপাটের শিকার হয়ে ঐশ্বর্যমন্ডিত বাংলা তার আর্থিক জৌলুস হারাতে বসে এবং কালের পরিক্রমায় সে আর্থিকভাবে পঙ্গু হয়ে পড়ে। পলাশী যুদ্ধ পরবর্তী বাংলার আর্থিক ক্ষতি ছিল এককথার অপরিমেয় অপূরণীয়।

www.nagorikpathagar.org

মুসলমানদের অপূরণীয় ক্ষতি

পলাশী বিপর্যয়ের তাৎক্ষণিক এবং দীর্ঘমেয়াদী অপূরণীয় ক্ষতির শিকার হয় মুসলমানরা। হাজার বছর ব্যাপী ভারতবর্ষে বিরতিহীন সুশাসন বজায় রেখে যারা স্বদেশবাসীর হৃদয়-মন্দিরে সজ্জন আপনজন হিসেবে ভক্তি শ্রদ্ধার আসন স্থাপন করেছিলেন, সেই মুসলিম শাসনকেই ছুঁড়ে ফেলা হল পলাশী প্রহসনের মধ্য দিয়ে। কাজটি কারা করেছে তা পরিস্কার। এ ঘটনায় চক্রান্তকারীরা তাদের কৌশলগত সুবিধার্থে মীরজাফরকে সামনে রেখেছে। 'কেবলা হাকিম' হিসেবে যেন প্রকৃত সত্য আড়াল করা যায়। কয়েক বছরের মধ্যে ইংরেজ কুশীলবরা ক্ষমতার মঞ্চে সশরীরে আবির্ভূত হল; আর তাদের এদেশীয় সহযোগীরা তাদেরই ছত্রছায়ায় বিশেষ সুবিধাভোগী হিসেবে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে পথ চলতে লাগল। দু'পক্ষের অব্যাহত চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র আর নিপীড়নমূলক আচরণের শিকার মুসলমানরা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সবদিক থেকে ধ্বংসের শেষ প্রান্তে উপনীত হল। মুসলমানরা অবশ্য তাদের বিপর্যয়কে আরও সুনিশ্চিত করেছিল স্বাধীনতা সূর্য পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করে। প্রতিবেশি সম্প্রদায় যখন ইংরেজদের সাথে তাদের পূর্ব নির্ধারিত বোঝাপড়া অনুসারে ইংরেজ শক্তিকে এদেশে সর্বাত্মক সহায়তা করার মাধ্যমে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিচ্ছিল, মুসলমানরা তখন আপোষহীন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত। তিতুমিরের বাঁশের কিল্লা, হাজী শরীয়তউল্লাহ্‌র ফরায়েজি আন্দোলন, ফকির বিদ্রোহ, ওয়াহাবী আন্দোলন, ১৮৫৭ সালের আজাদী আন্দোলন– এরকম অগণিত আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে ভারতের মুসলমানরা এদেশ থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করে স্বাধীনতা সূর্য পুনরুদ্ধারের সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। কিন্তু প্রতিবেশি সম্প্রদায় যেহেতু ইংরেজদেরকে এদেশে স্বাগত জানায় এবং যেহেতু ইংরেজদেরকে এদেশের ক্ষমতা দখল এবং পরবর্তীতে তা কুক্ষিগত রাখতে সর্বাত্মক সাহায্য করে, সেহেতু তারা মুসলমানদের তুলনায় বহুগুণে এগিয়ে যায়।

মুসলমানরা ছিল ভারতবর্ষে হাজার বছরের নিতান্ত প্রজাবৎসল শাসকের জাতি। পলাশী বিপর্যয় মুসলমানদেরকে এক ধাক্কায় রাস্তায় নামিয়ে দেয়। নিদারুণ ভাগ্যবিড়ম্বনায় পড়ে মুসলমানরা। আমির থেকে রাস্তার ফকির। তাদের রাজ্য কেড়ে নেয়া হল, ভাষা কেড়ে নেয়া হল, জমিদারী কেড়ে নেয়া হল, চাকরি-বাকরি কেড়ে নেয়া হল, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, জীবনাচার– সবই হাইজ্যাক করা হ'ল। সীমাহীন এই ট্র্যাজেডির উপর উল্লেখযোগ্য কোন লেখা আমরা পাই না, পাই না

www.nagorikpathagar.org

দায়িত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তেমন কোন রচনা। এর কারণও বোধ করি সকলের জানা। মজলুম জনগোষ্ঠী যখন দেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে জীবন বাজি রেখে আন্দোলন-সংগ্রামের পথকেই একমাত্র সমাধান হিসেবে বেছে নিয়েছিল, তখন জালেম বিদেশী শাসক ও তাদের এদেশীয় সহযোগীরা স্বাধীনতাকামী সেই জনগোষ্ঠীকে সমূলে ধ্বংস করাকেই চূড়ান্ত কৌশল হিসেবে বেছে নেয়। বিদেশী শাসকগোষ্ঠী কেবল অসির মাধ্যমেই সেই কাজটি করে নি, করেছিল মসির সাহায্যেও। তাদের ফরমায়েসী লেখকরা এমনভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাসসহ বিভিন্ন বই-পুস্তক লিখতে লাগল– যেখানে মুসলমানরা চিত্রিত হতে লাগল পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ জাতি হিসেবে; আর তারা নিজেরা তাদেরই কলমের জোরে চিত্রিত হতে লাগল নন্দিত জাতি হিসেবে। বিষয়টি ছিল একেবারেই চরম মিথ্যাচার এবং জাল-জালিয়াতির ভয়ংকর খেলা। কিন্তু তাতে ওদের কি আসে যায়? ওদের ১৯০ বছরের অসি ও মসির সম্মিলিত যুদ্ধে মুসলমানরা এমন অবস্থায় পতিত হল যেখান থেকে উত্তরণ আজও সম্ভব হয় নি, ভবিষ্যতে সম্ভব হবে না, যদি না মুসলমানরা নিজ দায়িত্বে আত্মানুসন্ধানে ঝাঁপিয়ে না পড়ে।

আজ একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে পলাশী-উত্তর মুসলমানদের দুর্দশার ভয়াবহ ছবিটি কল্পনা করাও প্রায় অসম্ভব। তবে আজকের পতিত মুসলিম জাতির অবস্থা দেখে পলাশী যুদ্ধের সুদূরপ্রসারী ফলাফল সম্পর্কে সহজেই অনুমান করা যায়। সেই সময়ের লেখক, সেই ইংরেজদেরই একজন ডাব্লিউ ডাব্লিউ হান্টার-এর 'দ্য ইন্ডিয়ান মুসলামান' গ্রন্থটি একটু সতর্কতার সাথে পাঠ করলে যে কোন পাঠক সেই সময়ে মুসলমানদের উপর আপতিত জুলুম-নির্যাতনের খানিকটা ছবি দেখে নিতে পারেন। ডাব্লিউ ডাব্লিউ হান্টার তাঁর 'দ্য ইন্ডিয়ান মুসলামান' গ্রন্থে পলাশী-উত্তর মুসলমানদের সীমাহীন দুরবস্থার আংশিক একটি চিত্র এঁকেছেন তা পড়লে গা শিউরে ওঠে। বইটি থেকে খানিকটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি–

> 'তারা আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, আমরা তাদের ধর্মানুসারীদের জীবনের সবরকম সম্মানজনক রুযি-রোযগারের পথ বন্ধ করে দিয়েছি। তারা আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে যে, আমরা এরকম এক শিক্ষাপ্রণালী আমদানি করেছি, যার দ্বারা তাদের সমগ্র সম্প্রদায় বেকার হয়ে গেছে এবং তারা অপমান ও দারিদ্রের মুখে পতিত হয়েছে। তারা আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, আমরা তাদের আইন উপদেষ্টা বা কাযীর পদ তুলে দিয়ে তাদের হাযার হাযার পরিবারকে দৈন্য দশায় ফেলে দিয়েছি, অথচ এ-সব কাযী তাদের শাদী

www.nagorikpathagar.org

পড়াতো এবং স্মরণাতীত কাল ধরে ইসলামের শরীয়ত অনুযায়ী পারিবারিক বিধি-বিধানের তারাই ছিলো একমাত্র অধিকারী ও তত্ত্বাবধায়ক। তারা ামাদের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ তোলে যে, আমারা তাদেরকে ধর্মপালনের উপায়গুলি থেকে বঞ্চিত করে তাদের আত্মাকে বিপন্ন করে তুলেছি। সবার উপরে তাদের ফরিয়াদ হলো এই যে, আমরা তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে ইচ্ছাকৃত চাতুরীর সঙ্গে চুরি করেছি এবং শিক্ষার জন্য সৃষ্ট তাদের তহবিলগুলি সামগ্রিকভাবে আত্মসাৎ করেছি।'

(ডাব্লিউ ডাব্লিউ হান্টার : দ্য ইন্ডিয়ান মুসলমানস, আব্দুল মওদুদ অনূদিত, পৃ. ৯৭)

ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এসব যে মুসলমানদের নিছক অভিযোগ ছিল না তার প্রমাণ ব্রিটিশ বাবুর লেখা থেকেই দেখা যাক :

'আজও তারা সময়ে সময়ে তাদের পুরাতন গভীর জাতীয়তাবোধ এবং যুদ্ধ বিষয়ে বাহাদুরী প্রদর্শন করে থাকে ঠিকই; কিন্তু অন্য সকল বিষয়েই তারা ব্রিটিশ শাসনাধীনে আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত একটা জাতি মাত্র।'

(প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০)

ডাব্লিউ ডাব্লিউ হান্টার আরও লিখেন :

'একশো বছর আগে যে জাতির সরকারে ছিল একচেটিয়া অধিকার, আজ শাসনবিভাগের সকল স্তরেই তাদের আনুপাতিক সংখ্যা তেইশ ভাগের এক ভাগেরও কম হয়ে গেছে। এ তো গেল গেজেটেড চাকরি সম্বন্ধে, যেগুলোর বাঁটোয়ারা সতর্কভাবে লক্ষ্য করা হয়। প্রেসিডেন্সি শহর কলকাতার অন্যান্য নযরে-না-লাগা অফিসে মুসলমান বিতাড়নের কাজ আরও ভালভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। কয়েকদিন আগে একটা বড়ো ডিপার্টমেন্টে এমন একজন মুসলমান কর্মচারী খুঁজে পাওয়া যায়নি, যার দ্বারা মুসলমানী ভাষা (অর্থাৎ ফার্সি) পড়ানো যেতে পারে। সত্য কথা বলতে গেলে, এখন একজন মুসলমান কলকাতার কোনো অফিসে দরওয়ান, হরকরা কিংবা দফতরীর চেয়ে উঁচু পদের চাকরি পাওয়ার আশাই করতে পারে না।'

(প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২)

www.nagorikpathagar.org

'...যখন এ দেশটা আমাদের অধিকারে আসে, তখন মুসলমানরা ছিল শ্রেষ্ঠ জাতি, তারা শুধু দরাজ্‌দিল ও সবল বাহু নিয়েই শ্রেষ্ঠ ছিল না, তারা সরকারী গঠনমূলক কাজে এবং শাসন পরিচালনা সংক্রান্ত হাতে-কলমের বিদ্যায়ও ওস্তাদ ছিল। তবুও আজ মুসলমানদেরকে সরকারী চাকরি ও বেসরকারী কাজকর্ম থেকে সমানভাবে দূরে সরিয়ে দেয়া হচ্ছে।'

(প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২)

'...বাস্তবিক যে জাতি একদিন সমগ্র বিচারবিভাগ একচেটিয়াভাবে অধিকার করতো, আজ তাদের মধ্য থেকে একজন হাইকোর্ট জজ নিয়োগ করার কল্পনাও হিন্দু ও ইংরেজদের কাছে অসম্ভব মনে হয়।'

(প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২)

'...১৮৫২ থেকে ১৮৬৮সাল পর্যন্ত যে দুশো চল্লিশ জন দেশী উকিলকে ভর্তি করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে দুশো উনচল্লিশ জন হিন্দু এবং মাত্র একজন মুসলমান।'

(প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩)

'হাইকোর্টের আদিম বিভাগে এটর্নী, প্রক্টর ও সলিসিটরদের মধ্যে ১৮৬৯ সালে সাতজন হিন্দু ছিলেন, কিন্তু একজনও মুসলমান ছিলেন না। এই ব্যবসার যেদিকে তাকাই না কেন, একই পরিণতি নযরে পড়বে। ১৮৬৯ সালে হাইকোর্টের রেজিস্ট্রারের অফিসে সতেরজন উল্লেখযোগ্য চাকরিয়া ছিলেন, তাদের মধ্যে ছয়জন ইংরেজ ও এগারোজন হিন্দু, কিন্তু একজনও মুসলমান নেই। ক্লার্ক-অব-ক্রাউনের অফিসে ট্যাক্স অফিসারের অধীনে চারজন ইংজে ও পাঁচজর হিন্দু, ক্তি একজনও মুসলমান নেই। আদালতের অলিগলিতে, একাউন্ট অফিসে, শেরিফের অফিসে, করোনারের অফিসে এবং অনুবাদকের অফিসে কুড়িজন চাকুরিয়ার নাম দেখা যায়; তাঁদের মধ্যে আটজন ইংরেজ, এগারজন হিন্দু এবং মাত্র একজন বাঙলার মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি একজন সামান্য 'মওলা' বা আইন কর্মচারী, তাঁর মাহিনা হফতায় ছয় শিলিং মাত্র।'

(প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩)

www.nagorikpathagar.org

'এ দেশটা আমাদের হুকুমাতে আসার আগে মুসলমানরা শুধু শাসন ব্যাপারেই নয়, শিক্ষাক্ষেত্রেও ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতি ছিল।'

'...মুসলমান যুবকদের সামনে সরকারী জীবনোপায়ের সব দরওয়াজাই বন্ধ হয়ে গেছে।'

(প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭)

'ছোটো বড়ো সবরকম চাকরি ক্রমে ক্রমে মুসলমানদের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে অন্য জাতিকে বিশেষ করে হিন্দুদেরকে দেওয়া হচ্ছে। সব জাতির প্রজাকে সরকার সমান নজরে দেখতে বাধ্য, কিন্তু যামানা আজকাল এমন হয়েছে যে, সরকারী চাকরি থেকে বাদ দেওয়ার জন্য গেজেটে মুসলমানদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। কিছুদিন আগে সুন্দরবন অঞ্চলের কমিশনারের অফিসে কয়েকটি চাকরি খালি বলে কমিশনার সাহেব সরকারী গেজেটে সে সম্পর্কে বিজ্ঞাপন দিয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে, চাকরিগুলি কেবল হিন্দুদেরকে দেওয়া হবে। মুসলমানরা আজকাল এতদূর নীচে নেমে গেছে যে, তারা সরকারী চাকরির জন্য উপযুক্ত হলেও সরকারী ইশতেহারে তাদেরকে বিশেষভাবে বাদ দেওয়া হয়। কেউ তাদের অবস্থা চেয়ে দেখে না এবং সরকারী উপরিওয়লারা তাদের অস্তিত্ব স্বীকার করতে রাযি নন।'

(প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫)

'উড়িষ্যার মুসলমানদেরকে ক্রমাগত নীচে দাবিয়ে রাখা হচ্ছে, তাদের উঠবার আশা নেই। ভদ্রঘরে জন্ম নিয়ে বেকার হয়ে মুরুব্বিহীন অবস্থায় আমরা আজ পানি থেকে ডাঙ্গায় তোলা মাছের দশায় পড়েছি। মুসলমানদের এই ভয়াবহ দুর্গতির বিষয় আজ আপনার হুযুরে পেশ করছি; কারণ আমরা বিশ্বাস করি যে, জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল প্রজাই ন্যায়বিচার পাবে। পুরাতন আমলদারীতে আমরা যে-সব চাকরি পেতাম, আজ সে-সব না পাওয়াতে আমরা এরূপ সহায়সম্বলহীন হয়ে পড়েছি ও চিরস্থায়ী হতাশায় ডুবে যাচ্ছি যে, আমরা আজ সত্যিকারভাবে একমনে প্রকাশ করছি যে, আমরা দুনিয়ার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যেতে রাযী আছি, হিমালয়ের তুষার ঢাকা সর্বোচ্চ শিখরে উঠতে প্রস্তুত আছি, এমন কি সাইবেরিয়ার নির্জনতম অঞ্চলেও ছুটতে রাযী আছি, যদি এই প্রতিশ্রুতি পাই যে, এররকম ছুটাছুটি করার ফলে

www.nagorikpathagar.org

হফতায় অন্তত: দশ শিলিং মাহিনার কোন সরকারী চাকরি আমাদের বরাতে জুটতে পারে।' (উড়িষ্যার কমিশনারের কাছে মুসলমানদের লেখা চিঠি)

(প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২)

ব্রিটিশ বাবুদের লেখা উদ্ধৃতি থেকেই একটি বিষয় পরিস্কার যে, পলাশী ট্র্যাজেডি মুসলমানদের ভাগ্যাকাশকে মহাদুর্যোগময় করে তুরেছিল। তবে একটি বিষয় ভুলে গেলে চলবে না। আর তা হল, **পলাশী ট্র্যাজেডির পর কেবল মুসলমানরাই নয়, দুর্ভাগ্যের তিমিরে তলিয়ে যায় গোটা ভারতবর্ষই যার খেসারত যেমন দিতে হয়েছে তখন, তেমনি দিতে হচ্ছে এখনও।**

www.nagorikpathagar.org

পলাশী ষড়যন্ত্রকারীদের পরিণাম

পলাশী ষড়যন্ত্রের যারা নেতৃত্ব দিয়েছিল পরবর্তীকালে তাদের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হয়েছিল। প্রায় সকলেরই মৃত্যু হয়েছিল মর্মান্তিকভাবে। কাউকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে, কেউ দীর্ঘদিন কুষ্ঠ রোগে ভুগে মারা গেছেন, কাউকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারা হয়েছে। আবার কাউকে নদীতে ডুবিয়ে মারা হয়েছে, কেউ বা নিজের গলায় নিজেই ছুরি বসিয়েছে। অস্বাভাবিক পন্থায় এবং অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে হয়েছে তাদের । আল্লাহর কঠিন শাস্তি থেকে তাদেরকে কেউ উদ্ধার করতে পারেনি। শুধু তাই নয়, মৃত্যুর পরেও এই উপমহাদেরশের সকল মানুষ তথা বিশ্ববাসী যুগ যুগ তথা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাদের এই অপকর্মের প্রতি তীব্র নিন্দাবাদ ও ঘৃণা প্রকাশ করে আসছে। এই ষড়যন্ত্রকারীরা কে কীভাবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

www.nagorikpathagar.org

মীরণ

পলাশী ষড়যন্ত্রের অন্যতম প্রধান নায়ক ছিলেন মীরণ। তার পুরো নাম মীর মহম্মদ সাদেক আলি খান। তিনি মীর জাফরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। নাজমুদ্দৌলা ও সাইফুদ্দৌলা যথাক্রমে মধ্য ও কনিষ্ঠ পুত্র।

আলিবর্দী খানের ভগ্নী শাহ খানম এর গর্ভে মীরণের জন্ম হয়েছিল। এই সূত্রে মীরণ ছিলেন আলিবর্দীর বোনপো। মীরণ যে অত্যন্ত দুর্বৃত্ত, নৃশংস ও হীনচেতা ছিল সে ব্যাপারে কারো কোনো সন্দেহ নেই। সিরাজ হত্যাকান্ডের মূল নায়ক মীরণ। আমিনা বেগম, ঘষেটি বেগম হত্যার নায়কও তিনি। সিরাজ পত্নী লুৎফুন্নেসার লাঞ্ছনার কারণও মীরণ। মির্জা মেহেদীকেও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিলেন মীরণ। মীর জাফরের সকল অপকর্মের হোতা ছিলেন তিনি। মীরণের প্ররোচনাতেই মীর জাফর চলতেন।

এই মীরণকে ইংরেজদের নির্দেশে হত্যা করেছিল মেজর ওয়ালস। তবে তার মৃত্যুর ব্যাপারে অপর বর্ণনায় রয়েছে যে, মীরণ বিহারে শাহজাদা আলি গওহরের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে পথের মধ্যে বজ্রপাতে নিহত হন। কথিত আছে যে, মীরণের আদেশে সিরাজের মাতা আমিনা ও খালা ঘষেটি বেগম জলমগ্ন হওয়ায়, তাঁরা মৃত্যুকালে মীরণকে বজ্রাঘাতে প্রাণপরিত্যাগের জন্য অভিশম্পাত করে যান। এই জন্য অনুমান করা হয় যে, মীরণের বজ্রাঘাতেই মৃত্যু হয়েছিল। ইংরেজরা বলছে, বজ্রপাতের ফলে তার তাঁবুতে আগুন ধরে যায় এবং তাতেই তিনি নিহত হন। *(অক্সফোর্ড হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া, ভিনসেন্ট এ, স্মিথ।)*

নিখিল নাথ রায় তার 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, মীরণের মনে স্বাধীনতার ইচ্ছা বলবত হওয়ায় মীর কাশিমের সাহায্যে তাঁকে কৌশলপূর্বক নিহত করা হয়। পরে বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়েছে বলে প্রকাশ করা হয়।

ভিনসেন্ট এ, স্মিথ এর অক্সফোর্ড হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে পরিস্কার বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, মীরণের মৃত্যুর জন্য ইংরেজ এবং মীর কাশিম উভয়কেই সন্দেহ করা হয়। আসলেই মীরণকে হত্যা করা হয়েছিল। মীর জাফর ইংরেজদের সাজানো গল্পটি বিশ্বাস করেননি। তিনি জানতেন, মিরণকে ইংরেজরা হত্যা করেছে। কিন্তু কাপুরুষ মীর জাফরের কান্না ছাড়া আর কিছু করার ছিলো না। এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে তিনি জানতেন তার নিজের নবাবী ও জীবনটাও চলে যেতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

মোহাম্মদী বেগ

সিরাজের ব্যক্তিগত চাকর ছিল মোহাম্মদী বেগ। সে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পিতা ও মাতামহের অন্নে প্রতিপালিত হয়েছিল। আলীবর্দীর খাঁর স্ত্রী একটি অনাথ কুমারীর সাথে তার বিয়ে দিয়েছিলেন। ১৭৫৭ সালে ৩ জুলাই মোহাম্মদী বেগ বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে নির্মর্মভাবে হত্যা করেছিল। নবাব সিরাজ এ সময় তার কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাননি। তিনি কেবল তার কাছ থেকে দু'রাকাত নামাজ পড়ার সময় চেয়েছিলেন। কিন্তু কুখ্যাত মোহাম্মদী বেগ নবাব সিরাজকে সে সুযোগ দেয়নি। নবাবের শেষ ইচ্ছে প্রত্যাখ্যান করার পরপরই তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে মোহাম্মদী বেগ মাথা গড়বড় অবস্থায় বিনা কারণে কুপে ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করেছিল।

মীর জাফর আলী খান

ক্লাইভের গাধা ও চিরকালের বিশ্বাসঘাতক হিসেবে পরিচিত মীরজাফর আলী খান অত্যন্ত দীন-হীন অবস্থায় ভাগ্যান্বেষণে ইরাকের নজফ থেকে বাংলায় এসেছিলেন। সিরাজের নানা বাংলা-বিহার উড়িষ্যার অবিসংবাদিত নবাব আলিবর্দী খাঁ অসহায় মীরজাফরকে আশ্রয় দিয়ে ধাপে ধাপে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যান। এক পর্যায়ে আলিবর্দী খাঁ তাকে প্রধান সেনাপতি করেন এবং নিজ বৈাত্রেয় বোন শাহ থানামের সাথে তার বিয়ে দেন। শাহ খানমের গর্ভেই জন্ম হয়েছিল কুখ্যাত মীরণের। মণি বেগম ও বাব্বু বেগম নামে মীরজাফরের আরও দু'জন স্ত্রী ছিল।

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং স্বদেশী জগৎশেঠ, রাজবল্লভদের সম্মিলিত চক্রান্তের গর্দভ মীরজাফর ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৯ শে জুন বিকেল বেলা ক্লাইভের হাত ধরে বাংলার মসনদে বসেন। কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং এদের এদেশীয় দোসর জগৎশেঠদের হাতে। শুরু হ'ল সম্মিলিত লুটপাটের রাজত্ব। পলাশী যুদ্ধের পূর্বে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক ক্লাইভ ও তার দলবলের পাওনা মেটাতে গিয়ে রাজকোষ একেবারে শূণ্য হয়ে পড়ল। মীরজাফর দিশেহারা হয়ে পড়লেন। এরই মধ্যে পুত্র মীরণের অপমৃত্যুর খবর এল। মানসিকভাবে একেবারে ভেঙে পড়লেন মীরজাফর। এদিকে অর্থাভাবে

সৈন্যদের বেতন বাকি পড়ায় তারা বিদ্রোহ করে। জগৎশেঠের কাছে সাহায্য চাইলেন মীরজাফর। কিন্তু জগৎশেঠ সাহায্য না করে আবারও বেছে নিলেন চক্রান্তের পথ। ইংরেজ ও জগৎশেঠের চক্রান্তে মীরজাফর ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে গদিচ্যুত হন। মসনদে বসানো হ'ল তারই জামাতা মীরকাশিমকে। স্মরণ করা যেতে পারে, পলাশী প্রহসনের পর হত-বিহ্বল বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা যখন বাংলার স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে পুনঃশক্তি সঞ্চয় করার জন্যে পাটনার পথকে বেছে বাংলার স্বাধীনতার শেষ তরীটি ভাসিয়েছিলেন, তখন এই মীরকাশিমই তাঁকে ভগবানগোলা থেকে আটক করে মুর্শিদাবাদে নিয়ে এসেছিলেন।

যা হোক, স্বাধীনতাবিরোধী কাজের জন্যে অনুশোচনায় দগ্ধ মীরকাশিম ক্ষমতা পেয়ে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য পুনরুদ্ধারের বাসনা নিয়ে ইংরেজ ও জগৎশেঠদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে থাকেন। ইংরেজরা প্রমাদ গুণল। যুদ্ধ ঘোষণা করল মীরকাশিমের বিরুদ্ধে। ১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে বক্সারের তৃতীয় যুদ্ধে মীরকাশিমকে ইংরেজরা পরাস্ত করে। সর্বস্ব হারানোর আগেই মীরকাশিম অবশ্য অত্যন্ত দক্ষতার সাথে একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেন। বাংলার বিশ্বাসঘাতক, ষড়যন্ত্রকারী ও স্বাধীনতাবিরোধী প্রায় সব ক'জনকেই তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিয়ে যান। দেওয়ান রাম নারায়ণকে বালুর বস্তার মধ্যে পুরে গঙ্গায় ডুবিয়ে দেন। জগৎশেঠ মাহতাব চাঁদ, স্বরূপ চাঁদ ও রাজবল্লভকে মুঙ্গের দুর্গের চূড়া থেকে নিক্ষেপ করলেন নদীতে। আর রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণবল্লভের করলেন শিরশ্চেদ।

উদ্ভুত পরিস্থিতিতে ইংরেজরা মীরকাশিমকে উৎখাত করল এবং নিরুপদ্রব গর্দভ শ্রেণির মীরজাফরকে ১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে পুনরায় বাংলার সিংহাসনে বসায়। এবার মীরজাফরের উপদেষ্টা করা হ'ল পলাশীর কুখ্যাত ষড়যন্ত্রকারী নন্দকুমারকে। মীরজাফর পূর্বের মতোই বাংলার ভান্ডার খুলে দিলেন ইংরেজ ও তাদের সাঙ্গ-পাঙ্গদের লুটপাটের জন্যে।

কিন্তু সিরাজের বিরুদ্ধে, বাংলার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে চক্রান্তে যোগদানকারী এই পাপিষ্ঠকে ইতিহাস ক্ষমা করবে কেন? দ্বিতীয়বার নবাবীতে তিনি আক্রান্ত হলেন মারাত্মক কুষ্ঠরোগে। তারা সারা শরীর পঁচতে লাগল। লোকচক্ষুর আড়ালে আলীবর্দীর কেল্লায় এক অন্ধকার ঘরে তার দিন-রাত কাটতে লাগল। কদাচিৎ তিনি প্রাসাদের বাইরে বের হতেন। কাউকে দর্শন দিতে চাইতেন না। কেউ দেখা করতে চাইলে তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তেন। কুষ্ঠব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে

এহেন মর্মান্তিক অবস্থায় নিতান্ত মানবেতর জীবন যাপন করে এক পর্যায়ে তার মৃত্যু হয়। নিখিলনাথ রায় লিখেছেন–

> 'ক্রমে অন্তিম সময় উপস্থিত হইলে, হিজরী ১১৭৮ অব্দের ১৪ ই শাবান (১৭৬৫ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে) তিনি কুষ্ঠরোগে ৭৪ বছর বয়সে পরলোকগত হন।'

জগৎশেঠ ও স্বরূপ চাঁদ

আলীবর্দী খাঁর শাসনামল থেকেই জগৎশেঠের সাথে ইংরেজদের সম্পর্ক অতি গভীর ছিল। নবাব সিরাজ ক্ষমতায় এলে এই গভীরতা আরো বৃদ্ধি পায় এবং তা ষড়যন্ত্রে রূপ নেয়। পলাশী বিপর্যয়ের পর জগৎশেঠ রাজকোষ লুণ্ঠনে অংশ নেন।

১৭৬০ সালে মীর জাফর সিংহাসনচ্যুত হলে তাঁর জামাতা কাসেম আলি খাঁ (মীর কাশিম) ক্ষমতায় বসেন। এ সময় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ইংরেজদের সাথে তার বিরোধ বাঁধে। জগৎশেঠ ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং তিনি ইংরেজ ও মীর জাফরের কাছে মীর কাশিমের বিরুদ্ধে কয়েকটি পত্র প্রদান করেন। পত্রগুলো কৌশলে মীর কাসেমের হস্তগত হয়। এজন্য মীর কাশিম জগৎশেঠ মহাতপচাঁদকে বন্দী করে মুঙ্গেলে পাঠাবার জন্যে ফৌজদার মহম্মদ তকী খাঁর প্রতি আদেশ পাঠান। তকী খাঁ তাদেরকে হীরাঝিলের প্রাসাদে বন্দী করে রাখেন। পরে নবাবের সেনাপতি আর্মেনীর মার্কার নবাবের আদেশে সসৈন্যে তাদেরকে নিতে মুঙ্গেলে উপস্থি হন। তাদেরও সেখানে আটক রাখা হয়। ইংরেজ গভর্নর ২৪ এপ্রিল ১৭৬৩ নবাবকে লিখে পাঠালেন– 'আমি এই মাত্র অমিয়টের পত্রে অবগত হইলাম যে, মহম্মদ তকী খাঁ রজনীতে জগৎশেঠ ও স্বরূপচাঁদের বাড়িতে প্রবেশ করিয়া, তাহাদিগকে বন্দী অবস্থায় হীরাঝিলে আনিয়া রাখিয়াছে। এই ঘটনায় আমি অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়াছি। যখন আপনি শাসন কার্যের ভার গ্রহণ করেন, তখন আপনি, জগৎশেঠ ও আমি সমবেত হইয়া, এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলাম যে, শেঠেরা বংশমর্যাদায় দেশের মধ্যে সর্বপ্রধান, অতএব শাসনকার্যে আপনাকে তাঁহাদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাঁহাদিগের কোনোরূপ অনিষ্ঠ না করিতে আপনি স্বীকৃত হন। মুঙ্গেলে আপনার সহিত সাক্ষাৎকালে আমি শেঠদিগের কথা আপনাকে

www.nagorikpathagar.org

বলিয়াছিলাম এবং আপনিও তাঁহাদিগের কোনো ক্ষতি করিবেন না বলিয়া আমাকে নিশ্চিত করেন। তাঁহাদিগের তৎপরোনাস্তি অবমাননা করা হইয়াছে। আপনার সুনামে কলঙ্ক পড়িয়াছে। তাহাদিগের এরূপ গৃহ হইতে আনয়ন করা অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে। ভূতপূর্ব কোনো নাজিম তাহাদিগের প্রতি এরূপ ব্যবহার করেন নাই। সুতরাং আপনি সৈয়দ মহম্মদ খাঁ বাহাদুরকে (মুর্শিদাবাদের ফৌজদার) তাঁহাদিগের মুক্তির জন্য লিখিয়া পাঠাইবেন।'

মীর কাশিম ২ মে তার এক সুদীর্ঘ প্রত্যুত্তর লিখে পাঠান। তাতে তিনি লিখেন–

> 'শেঠের ইংরেজদিগের সহিত যোগ দিয়াছে বলিয়া আমি তাহাদিগকে আনিতে পাঠাই নাই। যখন আমি শাসনভার গ্রহণ করি, তখন শেঠেরা আমায় সাহায্য করে নাই এবং আপনাদিগের কারবারও সুন্দররূপে নির্বাহ করে নাই। আমি যখনই তাহাদিগকে আহবান করিয়াছি, তখনই তাহারা আমার আদেশ অমান্য করিয়াছে এবং আমাকে তাহাদের শত্রু মনে করিয়াছে। এক্ষণে আমার কার্য নির্বাহের জন্য তাহাদিগের বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে বলিয়া, আমি তাহাদিগকে আহবান করিয়াছি। আশ্চর্যের বিষয় যে, আপনারা প্রতিদিন সিপাহি পাঠাইয়া আমার আমীন ও অন্যান্য কর্মচারীদিগকে ধৃত করিয়া অযথা অত্যাচারের সহিত তাহাদিগকে বন্দী করিয়া রাখিতেছেন। আপনাদের ঐরূপ ব্যবহারে সন্ধিভঙ্গ হইয়া যায়। আমি তাহাদিগকে সরকারের ও তাহাদের নিজের কার্যনির্বাহের জন্য মুঙ্গেলে আনয়ন করিয়াছি, তাহাদিগকে এখানে আনিবার অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই।'

নিখিলনাথ রায় লিখেছেন–

> 'ইহার পর ক্রমে ইংরেজদিগের সহিত মীর কাশিমের বিবাদ গুরুতর হইয়া উঠিলে, নবাব কাঠোয়া, গিরিয়া, উদয়ানালা প্রভৃতি স্থানে পরাজিত হইয়া মুঙ্গেলে জগৎশেঠ ও অন্যান্য বন্দী কর্মচারী এবং রাজা ও জমিদারদিগের বিনাশ সাধন করেন। জগৎশেঠ মাহতাপচাঁদকে অত্যুচ্চ দুর্গশিখর হইতে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করেন। মহারাজ স্বরূপচাঁদেরও ঐ সাথে ইহজীবনের লীলা শেষ হয়।'

www.nagorikpathagar.org

রবার্ট ক্লাইভ

ছোট বেলা থেকেই বাবা-মা'র অবাধ্য, বেপরোয়া মিথ্যুক, শঠ ও প্রতারক ক্লাইভ মাত্র সতের বছর বয়সে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকরি নিয়ে ইংল্যান্ড থেকে ভারতবর্ষে আসেন। কোম্পানির ব্যবসার মালামাল ওজন আর কাপড় বাছাই করতে করতে বিরক্ত হয়ে ক্লাইভ দু'বার পিস্তল হাতে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন, কিন্তু গুলি বের হয় নি বিধায় ভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে যান।

ভারতে বাণিজ্যরত ফরাসি বণিকদের বিরুদ্ধে ছোট–খাট কয়েকটি সংঘর্ষে বীরত্ব প্রদর্শন করে ক্লাইভ তার সতীর্থদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বোম্বাই-এর জলদস্যুদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে ক্লাইভ হলেন কর্নেল ক্লাইভ। একই সাথে তিনি মাদ্রাজের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডেপুটি মেয়রের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন।

এদিকে কলকাতায় অবস্থানকারী ইংরেজরা বাংলার নবাবের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ করতে থাকলে ১৭৫৬ সালের ১৯ শে জুন নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা ইংরেজদের ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ দখল করেন এবং আগ্রাসী ইংরেজদের শাসিয়ে দেন। কিন্তু ইংরেজ পক্ষের গভর্নর ড্রেক পালিয়ে মাদ্রাজ চলে যান। সেখান থেকে কর্নেল ক্লাইভ ও তার বাহিনী কলকাতায় আসেন এবং যুদ্ধে জয়লাভ করে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ অধিকার করেন।

বাংলার মাটিতে পা রেখেই ধূর্ত ক্লাইভ বুঝতে পারলেন, এটিই যেন তার কাঙ্খিত ঠিকানা। 'আত্মঘাতি বাঙালি'র সন্ধান পেয়ে গেলেন তিনি-যারা নিজের স্বার্থে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিক্রি করতে পারে! চক্রান্তকারীদের সাথে নিয়ে তিনি পলাশীর প্রান্তরে যুদ্ধ নামক এক প্রহসনের মাধ্যমে নবাব সিরাজকে ক্ষমতাচ্যুত করে বাংলার স্বাধীনতা হরণ করেন এবং তাঁকে মর্মান্তিকভাবে হত্যা করেন।

কোম্পানির সামান্য কর্মচারি হিসেবে খালি হাতে ভারতে আসা ক্লাইভ বিপুল অর্থ-বিত্ত নিয়ে ১৭৬০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নিজ দেশ ইংল্যান্ডে ফিরে যান। কোম্পানির সদর দপ্তর থেকে বিপুল ক্ষমতা নিয়ে ১৭৬৪ সালের জুন মাসে ক্লাইভ আবার ভারতে আসেন। ১৭৬৭ সালের জুলাই মাসে চিরদিনের মতো ভারত ছেড়ে ইংল্যান্ডে ফিরে যান। কিন্তু তার মনে স্বস্তি নেই। নিজ দেশে তিনি অভিযুক্ত হয়েছেন। অপমানের জ্বালা সইতে না পেরে ১৭৭৪ সালের ২২ শে নভেম্বর বাথরুমে ঢুকে দাড়িকাটা ক্ষুর দিয়ে নিজের গলা কেটে আত্মহত্যা করেন। চরম অসৎ, মিথ্যাবাদী, পররাজ্য লুণ্ঠনকারী, বিশ্বাসঘাতকদের পৃষ্ঠপোষক ক্লাইভের এ পরিণতি ছিল অনিবার্য।

www.nagorikpathagar.org

রায় দুর্লভ

আলীবর্দী খাঁর বিশ্বস্ত আমাত্য বিহারের ডেপুটি মেয়র রাজা জানকীরামের ছেলে রায়দুর্লভ ছিলেন উড়িষ্যার পেশকার। ১৭৫২ সালে জানকীরাম মারা যান। রঘুজি ভোঁসলা উড়িষ্যা আক্রমণ করলে রায়দুর্লভ বন্দী হন। ৩ লক্ষ টাকা জরিমানা দিয়ে তিনি ছাড়া পান এবং মুর্শিদাবাদ চলে আসেন। প্রথমে রাজা রামনারায়ণের মুৎসুদ্দি পদে চাকরি পান এবং পরে নবাব আলীবর্দী খাঁর সেনাবিভাগে নিযুক্ত হন। কিন্তু দেশের শত্রুদের সাথে হাত মেলানোয় তার সাথে নবাব সিরাজের বিরোধের সূত্রপাত হয়। পলাশীর প্রান্তরে তিনি নিজে তো যুদ্ধ করেনই নি, বরং বাংলার পরাজয় নিশ্চিত করতে তিনি যুদ্ধ বন্ধের নির্দেশ দিতে নবাবকে বারবার প্ররোচিত করতে থাকেন। তার এবং মীরজাফরের এ অসৎ পরামর্শের কারণেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় নবাব ত্বরিৎ যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে মুর্শিদাবাদ প্রত্যাবর্তন করেন এবং যাবার আগে যুদ্ধ বন্ধের নির্দেশ দেন। ফলে ক্লাইভ একপ্রকার বিনা যুদ্ধেই জয়লাভ করেন।

কিন্তু দেশ ও মানুষের শত্রু, স্বাধীনতার দুশমন রায় দুর্লভকে করুণ পরিণতি বরণ করতে হয়েছিল। পলাশী যুদ্ধের পর মীরণ তার বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ আনে এবং তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। অবশ্য ইংরেজদের মধ্যস্থতায় তিনি মুক্তি পান। কিন্তু তাকে কলকাতায় পালিয়ে চলে যেতে হয়। ততদিনে তিনি একেবারেই নিঃস্ব, সহায়-সম্বলহীন।

www.nagorikpathagar.org

ইয়ার লতিফ খান

পলাশীর ষড়যন্ত্রকারীরা শুরুতে ইয়ার লতিফ খানকে ক্ষমতায় বসাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তিতে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে মীর জাফর আলী খানকে ক্ষমতায় বসান। পলাশী চক্রান্তের অন্যতম নায়ক ইয়ার লতিফ খান পলাশী যুদ্ধের পর অকস্মাৎ নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যান। অনেক ধারণা কে বা কারা তাকে গোপনে হত্যা করেছিল।

উমিচাঁদ

উমিচাঁদের আরেক নাম আমিন চাঁদ। আমিন চাঁদ জাতিতে শিখ; একজন শিখ ব্যবসায়ীর সাথে বাংলায় আসেন। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দাদন নিয়ে উমিচাঁদ বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

সিরাজের বিরুদ্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও তার এদেশীয় দোসররা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে ইতিহাসের জঘন্যতম অর্থ পিশাচ উমিচাঁদও তাতে যোগ দেয়। তবে কিছুদিন পর এ ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করার ভয় দেখিয়ে উমিচাঁদ ক্লাইভের নিকট ৩০ লক্ষ টাকা দাবি করে। অন্যথায় উমিচাঁদ এ ষড়যন্ত্র চুক্তির কথা নবাব সিরাজের নিকট প্রকাশ করে দিতে উদ্যত হয়। তখনই ধূর্ত রবার্ট ক্লাইভ দু'প্রস্থ চুক্তিনামা প্রস্তুত করেন- একটি সাদা ও লাল রঙের । সাদাটি আসল আর লালটি কৃত্রিম। লালটিতে উমিচাঁদের ৩০ লাখ টাকার উল্লেখ ছিলো- তাতে ওয়াটসন সাহেবের কোন স্বাক্ষর ছিলো না। ক্লাইভ ওয়াট্সনের স্বাক্ষর জাল করেছিলেন। কিন্তু সাদা দলিলের কোথাও উমিচাঁদ কিংবা উমিচাঁদের ৩০ লক্ষ টাকা প্রাপ্তির কোন কথাই ছিলো না।

মাত্র ৩০ লক্ষ টাকা প্রাপ্তির লোভে সে যুগের বিশ্বাসঘাতক উমিচাঁদ বাংলার স্বাধীনতা বিক্রয়ে সম্মত হয়ে পরিকল্পিত অপকর্মে নেমে পড়ে। পলাশী প্রহসনের সফল মঞ্চায়নের পর চুক্তি অনুযায়ী সকলের সকলের দেনা-পাওনা মেটানো হলেও উমিচাঁদকে কোন টাকা দেয়া হয় নি। সে ৩০ লক্ষ টাকা দাবী করা মাত্রই ক্লাইভ জাল চুক্তির কথা প্রকাশ করেন এবং দাবি অস্বীকার করেন। তখন জঘন্য অর্থ পিশাচ উমিচাঁদ চারিদিকে অন্ধকার দেখতে থাকে এবং এক পর্যায়ে

www.nagorikpathagar.org

বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যায়। টাকার জন্যে উমিচাঁদ ক্লাইভ এর সঙ্গে দেখা করতে গেলে ক্লাইভ তাকে তীর্থ যাত্রার পরামর্শ দেন। নিরুপায় উমিচাঁদ পথের কুকুরের মত এদিক-সেদিক ঘুরতে থাকে। এ ভাবে উমিচাঁদ তার দেশ বিরোধী, সিরাজ বিরোধী মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে করতে মালদহের কোন এক স্থানে সংজ্ঞা হারিয়ে রাস্তায় পড়ে যায় এবং ১৭৫৮ খ্রিস্টাব্দের ৫ ডিসেম্বর করুণ অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

নন্দকুমার রায়

পলাশী ষড়যন্ত্রের অন্যতম প্রধান হোতা ছিল মহারাজ নন্দকুমার রায়। দিল্লীর মুসলমান সম্রাটের নিকট থেকেই মহারাজ খেতাবটি পেয়েছিলেন নন্দকুমার। নবাব সিরাজউদ্দৌলা মসনদে আরোহণের পূর্বে কোন এক অপরাধে নন্দকুমারকে শাস্তি দিয়েছিলেন। নন্দকুমার কি অপরাধ করেছিলো হিন্দু ঐতিহাসিকেরা তা অবশ্য লেখেননি। যাহোক, নবাব সিরাজের দয়ায় নন্দকুমার হিজলী ও মহিষদল পরগণার তহশিলদারীর কাজ পেয়েছিলেন। এরপর কুচক্রী ক্লাইভের তোষামোদী করে নন্দকুমার তার ওকালতি পদ প্রাপ্ত হয়। ক্লাইভের সঙ্গে যারা গভীর সম্প্রীতি রাখার প্রয়োজন অনুভব করতো তারা কেউ কেউ নন্দকুমারকে The black colonel বলতো। ইংরেজের চাটুকার নন্দকুমার এতে ধন্য হতো।

১৭৫৬ খ্রিষ্টব্দে নন্দকুমার রায় নবাবের বিশেষ দয়ায় হুগলির ফৌজদার নিযুক্ত হন। কিন্তু কোলকাতা পুনরাধিকারের সময় বজহজে নবাবের সেনাপতি মানিক চাঁদ যেমন বিশ্বাসঘাতকতা করে পলায়ন করেছিলো, হুগলির বেলায় নন্দকুমারও তাই করেছিলো।

পলাশী ট্র্যাজেডির পর নন্দকুমাররা প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে দেশ ও মানুষের বিরুদ্ধে কাজ করতে থাকেন। কিন্তু ইংরেজ গভর্নর জেনারেল হেস্টিংস-এর সাথে তার ব্যক্তিগত বিরোধ আরম্ভ হলে তার বিরুদ্ধে হেস্টিংস প্রতিশোধ গ্রহণে তৎপর হয়ে ওঠেন। তিনি কাউন্সিলের সদস্য বারওয়েলের দ্বারা নন্দকুমারের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করেন। এ মামলা বিচারাধীন থাকাকালে জনৈক মোহন প্রসাদের দ্বারা নন্দকুমারের বিরুদ্ধে গভর্ণর হাইকোর্টে

www.nagorikpathagar.org

জাল করার অপরাধে আর একটি মামলাও রজ্জু করেন। মামলাটির বিবরণ নিম্নরূপ :

> 'মুর্শিদাবাদের জনৈক ধনী বোলাকী দাস নন্দকুমারের নিকট খত লিখিয়ে ৭০,০০০/- টাকা ধার করে। বোলাকী দাসের মৃত্যুর পর তার উত্তারাধিকারগণ উক্ত টাকা পরিশোধ করে এবং নন্দকুমারও ঐ দলিলের উর্দ্বাংশ খন্ডিত করে ফেলে। অভিযোগ হলো নন্দকুমার পুনরায় ঐ টাকা প্রাপ্তির জন্য খন্ডিত দলিলের একটি নকল খত তৈরি করে। এমন কি এতে মৃত বোলাকী দাসের স্বাক্ষর জাল করে সংযোজিত করে। হাইকোর্ট থেকে ঐ মামলা সুপ্রিম কোর্টে স্থানান্তরিত হয়। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জুরি বোর্ড গঠন করে ৮ দিনের মধ্যে উক্ত মামলার বিচারকার্য সম্পন্ন করেন-সুদীর্ঘ শুনানীর পরে নন্দকুমার দোষী প্রমাণিত হয়; কোর্ট তাকে ফাঁসির আদেশ প্রদান করেন।

নন্দকুমারের ফাঁসির মধ্যে দিয়ে পলাশী ষড়যন্ত্রের অন্যতম প্রধান এক কুশীলবের বিচার হলো তাদের নিজেদের লোকের দ্বারাই।

রাজা রাজবল্লভ

রাজা রাজবল্লভ জানকী রামের পৌত্র এবং দূর্লভ রাম বা রায় দুর্লভের পুত্র। অর্থাৎ কুখ্যাত রাজবল্লভ অপর কুখ্যাত রায়দুর্লভের পুত্র। যেমন পিতা তেমন পুত্র। বেঈমানীর ইতিহাসে পিতার উপযুক্ত পুত্র হিসাবে কুখ্যাত হয়ে আছে রাজবল্লভ।

রাজবল্লভের বাসস্থান ছিল ঢাকা জেলার রাজনগর পরগণায়। নবাব সরকারের নওয়াবা মহলের পেশকার হিসাবে কাজ করতো রাজবল্লভ। রাজবল্লভ পরে নবাব আলিবর্দির জামাতা ঢাকার শাসনকর্তা শাহমতের কর্মচারী হিসাবে কর্মরত থেকে অসুদপায়ে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করে। জেমস টেলর এ বিষয়ে লেখেন: রাজবল্লভ নবাব সরকারের অধিনে কাজে যোগ দিয়ে নিজে অসুদপায়ে ষড়যন্ত্রকারীদের জায়গা-জমি আত্মসাৎ করে যা পরবর্তীকালে রাজনগরের অতি মূল্যবান জমিদারী হিসাবে পরিগণিত হয়। রাজবল্লভ অতি অল্পসময়ের মধ্যে ২ কোটি টাকা আত্মসাৎ করে বলে জানা যায়। রাজভল্লব তার উপকারী নবাব পরিবার ও দেশের সম্পদ হরণের মধ্য দিয়ে বাংলার রাজনীতিতে প্রবেশ করে।

রাজবল্লভ চাটু ভাষা প্রয়োগ ও আনুগত্যের অভিনয় করে ঢাকায় ঘষেটি বেগমের 'দেওয়ান' পদে নিযুক্ত হয়েছিল। 'জগৎ শেঠ' প্রথমে নবাব সিরাজের মসনদচ্যুতির প্রস্তাব করলে রাজবল্লভ প্রমুখ তা সমর্থন করে। আর রাজবল্লভ, রায়দুর্লভের চরম বিশ্বাসঘাতকতাই দায়ী ছিল নবাব সিরাজের পতন তথা বাংলার স্বাধীনতা হারানোর।

পলাশি যুদ্ধের পরে রাজবল্লভ বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কারস্বরূপ বাংলার 'দেওয়ানি পদ' লাভ করে। এরপর রাজবল্লভ সে যুগে ৫ লক্ষ টাকা খরচ করে নদীয়া ও বেনারসের পন্ডিতদের এনে ব্রাহ্মণদের অনুরূপ ৬ গুণের পৈতা ধারণের অধিকার অর্জন করে। অবৈধভাবে উপার্জিত অর্ত দ্বারা রাজবল্লভ রাজনগর (যা পরে মলফৎগঞ্জ থানা) কে রাজকীয় সাজে সজ্জিত করেছিল।

কিন্তু ইতিহাস রাজবল্লভকে ক্ষমা করেনি। তাকে ও তার পাপের বিষয় সম্পত্তিকে ইতিহাস অতি ঘৃণার সঙ্গে কালের আবর্তে ছুঁড়ে ফেলেছে। নদী ভাঙ্গনে রাজবল্লভের ইমরতগুলি বিনষ্ট হল। প্রভু ইংরেজদের সাথে সম্পর্কে ফাটল ধরলো। নিজের পাপাচার ও দুষ্কর্মের জন্য রাজবল্লভ দীর্ঘদিন বেনিয়া ইংরেজদের অবহেলিত আশ্রয়ে এমন কি অন্ধকার কারাগারে দুর্বিসহ জীবন কাটাতে বাধ্য হয়। কারাগার থেকে এক পর্যায়ে মুক্তি পেলেও নবাব সিরাজ ও তাঁর পরিবার তথা দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার দরুণ রাজবল্লভ জনসাধারনের অতি ঘৃণার পাত্র হয়ে দীন-হীন অবস্থায় দুঃসহ নিপীড়ন ভোগ করেন। নবাব মির কাসিম ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে গলায় বালুর বস্তা বেঁধে রাজবল্লভকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করে হত্যা করেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়

পলাশী বিশ্বাসঘাতকদের অন্যতম ছিল নদীয়া কৃষ্ণনগরের জমিদার ভবানন্দ মজুমদারের অধস্তন পুরুষ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। কৃষ্ণচন্দ্র ইংরেজদের একান্ত প্রচেষ্টায় মুঘল সম্রাটের নিটক হতে 'মহারাজেন্দ্র বাহাদুর' উপাধিপ্রাপ্ত হয়। একবার কোনো এক গুরুতর অপরাধের জন্য কৃষ্ণচন্দ্রকে কারাভোগ করতে হয়েছিল। পরে নবাব আলিবর্দি খাঁর বিশেষ অনুগ্রহে কৃষ্ণচন্দ্র সে যাত্রায় রক্ষা পায়। ইংরেজ বেনিয়ারা কৃষ্ণচন্দ্রকে তার বিশ্বাসঘাতকতা ও নিজ দেশের বিরুদ্ধে কৃত অপকর্মের জন্য বিশেষভাবে স্মরণ করত। পলাশী নাটক সফল

www.nagorikpathagar.org

মঞ্চায়নের পুরস্কারস্বরূপ ক্লাইভ তাকে ৫টি কামান উপহার দিয়েছিল যা এখনো কৃষ্ণনগর জমিদার বাড়ীতে রক্ষিত আছে।

কিন্তু পলাশী ট্র্যাজেডির অন্যতম প্রধান হোতা কৃষ্ণচন্দ্রকে ইতিহাস ক্ষমা করে নি। ইংরেজরা যখন তাদের নিজেদের স্বার্থে মীর জাফর-এর পরিবর্তে তারই জামাতা মীর কাসিমকে নবাব পদে বসায়, তখন মীর কাসিম এক পর্যায়ে তাঁর অতীত ভুল শুধরানোর উদ্যোগ নেন এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। কিন্তু সেই সব বিশ্বাসঘাতক পলাশি যুদ্ধের মতো এবারও নবাবের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে গোপনে ইংরেজদের সাহায্য করতে থাকে। দেশদ্রোহিতার অভিযোগে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও তার পুত্র শিবচন্দ্রকে রাজধানী মুঙ্গেরে বন্দী করেন। বিচারে কৃষ্ণচন্দ্র ও শিবচন্দ্রের মৃত্যুদন্ডের আদেশ হয়েছিল। কিন্তু মুঙ্গের থেকে নবাবের দ্রুত প্রস্থানের কারণে বিশ্বাসঘাতক কৃষ্ণচন্দ্র ও শিবচন্দ্রের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। তবে ঐ কারাগারে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও তার পুত্রের যে দুর্গতি হয়েছিল তাতেই পলাশীর প্রান্তরে তাদের বিশ্বাসঘাতকার কিছুটা শাস্তি হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়।

নবাব মীর কাসিম

নবাব মীর কাসিম ইতিহাস কুখ্যাত মীর জাফরের জামাতা। তিনি নবাব সিরাজের নৌবাহিনীর একজন সেন্যাধ্যক্ষ হিসেবে প্রথম কর্মজীবন শুরু করেন। পলাশীর যুদ্ধে নবাব মীর কাসিম নবাব সিরাজ উদ্দৌলার বিরুদ্ধে বিশ্বসঘাতকতায় যোগ দেন। চরম বিশ্বাসঘাতকতার শিকার নবাব সিরাজউদ্দৌলা যখন দেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের আশায় মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করে নৌ পথে পশ্চাৎগমন করছিলেন, তখন পথিমধ্য থেকে তাঁকে সপরিবারে গ্রেফতার করে মীরজাফর ও ক্লাইভের দরবাওে উপনীত করেন নবাব মীর কাসিম। এরপর কাল বিলম্ব না কওে ক্লাইভের ইচ্ছায় মীরজাফরের পুত্র মীরণের হুকুমে সিরাজকে হত্যা করা হয়। পলাশীর ভূমিকায় মীর কাসিম ইতিহাসে ধিকৃত হন। অবশ্য পরবর্তী জীবনে তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পেরে ইংরেজদের উৎখাতের জন্যে সচেষ্ট হন। কিন্তু ততদিনে ভাগীরথির জল অনেক দূর প্রবাহিত হয়ে গেছে!

মীর জাফর নবাবী রক্ষায় ইংরেজ কোম্পানি ও কর্মচারীদের কোটি কোটি টাকা ঘুষ দিয়ে রাজকোষ শূন্য করতে থাকে। আরও অর্থ প্রাপ্তির আশায় ইংরেজ কর্মচারীরা মীর জাফরের অযোগ্যতার কথা ঘোষণা করে তারই জামাতা মীর কাসিমকে নবাবী প্রদান করেন। অবশ্য এ জন্য মীর কাসিম ইংরেজদেরকে ২০ লক্ষ টাকা ঘুষ দিয়েছিল। তবে নবাবি লাভের সঙ্গে সঙ্গে মীর কাসিম ইংরেজ বেনিয়াদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন। তখন তিনি তার ও দেশীয় বিশ্বাসঘাতকদের মারাত্মক ভুলের কথা বুঝতে পেরে নবাব সিরাজের পতনের জন্য হৃদয়ে মর্মান্তিক যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকেন। তিনি বুঝতে সক্ষম হন যে, পলামীর প্রান্তওে নবাব সিরাজের পতনের সাথে সাথে বাংলা তথা ভারতবের্ষর স্বাধীনতাও ইংরেজরা হরণ কওে ফেলেছে। ইংরেজদের এদেশে থেকে বিতাড়ন তথা স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে তিনি সেনাবাহিনী পুনর্গঠন করেন এবং সেনা ও গোলাবারুদ আমদানি করে মুর্শিদাবাদ থেকে রাজধানী মুঙ্গের স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু দেশীয় জমিদার ও আমলাদের বিশ্বাসঘাতকতায় মীর কাসিম একে একে কাটোয়া ঘোরিয়া ও উদয়নালার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বিতাড়িত হন। ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দে মীর কাসিম সুজা-উদ-দৌলা ও সম্রাট শাহ্ আলমের সম্মিলিত বাহিনী নিয়ে ইংরেজ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। বক্সারের এ যুদ্ধে সম্মিলিত জমিদার ও কর্মচারীদের বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি পরাজয় বরণ করেন এবং তাঁর পতন ঘটে। বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মীর কাসিম আত্মরক্ষায় গভীর এক অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইংরেজগণ অনেক খোঁজাখুঁজির পরে ও মীর কাসিমের কোনো সন্ধান পায় নি।

কিন্তু এরপরে ঘটে গেলো এক মর্মান্তিক ঘটনা যা নিম্নে উদ্ধৃত করা হল:

> 'মুঙ্গেরের গভীর জঙ্গলের নিকট প্রায়শ বাঁশি শোনা যেত গভীর রাতে। অদূরে ছিল ইংরেজ সেনানিবাস। ইংরেজ সৈন্যগণ বাঁশির শব্দকে ভূতের কারসাজি মনে করে জড়োসড়ো হয়ে থাকতো। কয়েকজন সাহসি ইংরেজ সৈনিক অতি গোপনে বনের কাছে গিয়ে লক্ষ্য করে দু'টি বাঘের বাচ্চা; আর তারাই বাঁশির শব্দ করছে। পরের রাতে বাঘের বাচ্চা দু'টি করুণ সুরে বাঁশি বাজাতে থাকলে গোপনে গিয়ে ওদের গুলী করে সৈনিকেরা। কাছে গিয়ে দেখে বাঘের ছাল পরিহিত দু'টি মানব শিশু। দু'জনের একজন গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবরণ করে। আরেকজন আহতাবস্থায় কোনো ভাবে পালাতে পারল, তারা 'গুল' ও 'বাহার' নামীয় মির কাসিমের পুত্র ও কন্যা-পাশে পড়ে রয়েছে খাবারের পাত্র। বাঁশি বাজিয়ে তারা তাদের পলাতক পিতা মির

কাসিমকে খাবার দিতে সাহায্য করত। এ ঘটনা কিছু কাল পরে নবাব মির কাসিমকে মৃত অবস্থায় দিল্লীর রাজপথের পার্শ্বে আবিস্কার করা হয়।'

(পলাশীর যুদ্ধ: বিশ্বাসঘাতকদের মৃত্যু-কাহিনী, মহসিন হোসাইন, জ্যোতিপ্রকাশ, ঢাকা)

স্ক্রাফটন

স্ক্রাফটন নামের এক ইংরেজ কর্মচারী পলাশী যুদ্ধের ষড়যন্ত্রের সহায়ক ছিলেন। জানা যায়, মুর্শিদাবাদের বিপুল সম্পদ লুট করে ইংল্যান্ড ফেরার পথে জাহাজ ডুবিতে তার নৃশংস মৃত্যু হয়।

ওয়াটস

ওয়াটস ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি নবাব সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের অন্যতম। এই ওয়াটসকে নবাব সিরাজদ্দৌলার ব্যক্তিগত অনুগ্রহপ্রাপ্ত ছিলেন তিনি। কিন্তু অকৃতজ্ঞ ওয়াটস রমনী সেজে মীর জাফরের প্রাসাদে গিয়ে ষড়যন্ত্র চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়ে এনেছিলেন। পলাশী যুদ্ধের পরে কোন এক অপরাধের জন্যে ওয়াটস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর চাকরি থেকে বরখাস্ত হন। ইংল্যান্ড গিয়ে তিনি চরম দারিদ্রাবস্থায় এবং অনুশোচনায় অকস্মাৎ মৃত্যুবরণ করেন।

www.nagorikpathagar.org

কৃষ্ণবল্লভ

কৃষ্ণবল্লভ ছিলেন রাজা রাজবল্লভের পুত্র। বিশ্বসঘাতকতা দেশদ্রোহিতার জন্য তিনি পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। এই কৃষ্ণবল্লভ পিতা রাজ বল্লভের আদেশে ঢাকা থেকে বিপুল পরিমাণ সম্পদ নিয়ে নবাবের আদেশ লংঘন বাংলার স্বধীনতার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী ও কোম্পানীর এই বিশ্বাসঘাতককে বন্ধী অবস্থায় হত্যা করেন। কৃষ্ণবল্লভ তার যোগ্য শাস্তি পেয়েছিলেন।

ঘসেটি বেগম

সিরাজের আপন খালা ঘসেটি বেগম ছিলেন পলাশী চক্রান্তের অন্যতম হোতা। পলাশী ট্র্যাজেডির পর মীরণ তকে নদীতে ডুবিয়ে হত্যা করে।

ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে যে, যারাই পলাশী চক্রান্তের সাথে জড়িত ছিল তাদেও প্রত্যেকেরই কোন না কোনভাবে এই নশ্বর পৃথিবীতেই প্রতিকী শাস্তি হয়েছিল। তবে এই পৃথিবীতে সেই সব চক্রান্তকারীর সবচেয়ে বড় শাস্তি এই যে, পথিবী যতদিন থাকবে ততদিন তাদেও নাম ঘৃণাভরে উচ্চারিত হবে।

www.nagorikpathagar.org

মীর জাফরের কৈফিয়ত

পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজ উদ্দৌলার সেনাপতি মীর জাফর আলী খানের বে-ঈমানী ও আত্মঘাতি ভূমিকার কারণে ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে তিনি নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। বাঙালি মাত্রের কাছেই মীর জাফর শব্দটি 'বিশ্বাসঘাতক' শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। অনেকেই পলাশীর যথার্থ ইতিহাস, এমনকি কোন ইতিহাসই হয়তো জানেন না; কিন্তু মীরজাফর শব্দের মানে বুঝেন। পলাশী-পরবর্তী ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে বাঙালি কোন বাবা-মা তার আদরের সন্তানের নাম 'মীরজাফর' রাখেন না। কেননা এ নামটি বিশ্বাসঘাতকতার সমার্থক।

তবে পলাশীর খলনায়কদের আলোচনা কেবল মীর জাফরের মধ্যে সীমিত রাখার এক ধরণের অপপ্রয়াস বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। ইতিহাসের কাঠকড়ায় মীর জাফরের যেমন করে বিচার হল, পলাশীর অন্য সব খলনায়ক, বিশেষত; জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, নন্দকুমার প্রমুখের অনুরূপ বিচার ইতিহাসে হয়নি। অথচ পলাশী ট্রাজেডির পূর্বাপর আলোচনায় দেখা যায় যে, পলাশীর মূল কুশীলব ছিলেন তারাই। মীর জাফরকে সাক্ষী গোপাল হিসাবে দাঁড় করিয়ে পলাশী ট্র্যাজেডির পূর্ণাঙ্গ নাটকটি যারা মঞ্চস্থ করিছিলেন, তারা আমাদের একপেশে ঐতিহাসিকদের বদান্যতায় সকল দায় থেকে যেন মাফ পেয়ে গেলেন! তবে প্রকৃতির আইনে এদের বিচার হয়েছে অর্থাৎ এদের সকলেরই অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে অসহায় পাঠকের এটুকুই সান্তনা।

যাহোক আমরা এখানে নবাবের সেনাপতি মীরজাফর আলী খানের উপর খানিকটা আলোচনার চেষ্টা করব-বিশেষত যিনি ছিলেন নবাব আলীবর্দী খানেরও সেনাপতি, যিনি সিরাজের সাথে আত্মীয়তার সূত্রেও আবদ্ধ ছিলেন, যিনি স্বীয় দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের ব্যাপারে পবিত্র কুরআন শরীফ ছুঁয়ে শপথ করেছিলেন সেই ব্যক্তিটি কেন পলাশীর যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করলেন, তিনি কেন তার অধীনস্থ পঞ্চাশ হাজার সেনার সুবিশাল এক বাহিনীকে ক্লাইভের তিন হাজার সেনার ক্ষুদ্র এক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দিলেন না, তিনি কেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাংলা বিহার উড়িষ্যা তথা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হবার কলংকিত ইতিহাসের সাক্ষীগোপাল হলেন? দেশ ও জাতির জন্য তাঁর

www.nagorikpathagar.org

হৃদয় কেন কেঁপে উঠল না? কুরআনের শপথকে তিনি কী করে অবজ্ঞা করতে পারলেন? তবে তিনি প্রকৃত মুসলমান ছিলেন না? তিনি কেন ক্লাইভ আর জগৎশেঠদের সাথে গোপনের সম্পাদিত দেশ বিরোধী চুক্তিকে অবজ্ঞা করে অন্তত: শেষ মুহূর্তে হলেও স্বাধীনতা রক্ষায় সচেষ্ট হলেন না?

ইতিহাসের পাঠকমাত্রেরই জানা আছে যে, মীর জাফর ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি এতটাই অর্বাচীন ছিলেন যে, সিরাজের পতন হলে যে স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়ে যাবে তা-ও বুঝতে পারেন নি! জগৎশেঠ, ক্লাইভরা মিলে তাকে এ কথা বুঝতে সক্ষম হন যে, পলাশীতে নবাবের হেরে যাওয়া মানে স্বাধীনতা সূর্য ডুবে যাওয়া নয়, বরং সিরাজের পরিবর্তে তার মত একজন ভাল নবাবের হাতে দেশ শাসনের ভার অর্পণ করা! গর্দভ এ লোকটি ওদের টোপ গিলল এবং এর ফল যা হবার তা-ই হল। ১৯০ বছরের জন্যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল; অন্ন-দাতা ভারত ভিখারীতে পরিণত হয়ে গেল; আর স্থায়ীভাবে অত:পতিত হয়ে পড়ল ভারতবর্ষের মুসলমানরা।

যে মীর জাফরের নির্বুদ্ধিতা আর বিশ্বাসঘাতকতার খেসারত নানাভাবে এখনো দিতে হচ্ছে ভারতবাসীকে সেই মীর জাফরের বিচার ইতিহাসের কাঠগড়ায় হয়েছে বটে, কিন্তু তার কৈফিয়ত বা প্রতিক্রিয়া জানার সুযোগ পেলে আমাদের সবিশেষ উপকার হতো। কিন্তু তা পাবার তো আর সুযোগ নেই। তবে, কবির কল্পনায় তার একটি দীর্ঘ কৈফিয়ত-এর সন্ধান আমরা পেয়েছি। কবিতাটি হল কবি ফররুখ আহমদের 'মীর জাফরের কৈফিয়ত'। বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সংযোজন এ কবিতাটি কেবল কাব্য বিচারেই নয়; বরং 'মীর জাফর' চরিত্রটি যথার্থ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তা চিন্তার নতুন দিগন্ত উন্মোচনের কৃতিত্বের দাবীদার। মীরজাফরের বিশ্বসঘাতকতার দিকটি কারোর দৃষ্টি না এড়ালেও দৃষ্টির আড়ালে পড়ে গেছে মীরজাফর সৃষ্টির দীর্ঘ পটভূমি তথা হেরার রাজতোরণ থেকে মুখ ফেরানো বিশ্বাজয়ী একটি জাতির চরম গ্লানিকর জীবনে আত্মাহুতি দেয়ার ট্রাজেডি পর্বটি। মীর জাফর একদিনে তৈরি হয় নি, মীর জাফর মূলত ক্ষয়িষ্ণু মুসলিম সমাজেরই প্রতীকী চরিত্র। মুসলিম রেনেসাঁর কবির ফররুখ আহমদ (রহ.) অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ক্ষয়িষ্ণু মুসলিম সমাজের গ্লানিকর সে চিত্রটি এঁকেছেন তাঁর 'মীর জাফরের কৈফিয়ত' শীর্ষক দীর্ঘ কবিতায়। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় কবিতাটি এখানে পত্রস্থ করা হল যেখান থেকে চিন্তাশীলরা চিন্তার অনেক খোরাক খুঁজে পাবেন।

www.nagorikpathagar.org

মীর-জাফরের কৈফিয়ত

–ফররুখ আহমদ

মীর-জাফরের সাথে দেখা হল একদা নিশীথে
আশ্চর্য স্বপ্নের মত (অহিফেন ছিল যা শিশিতে
যথারীতি সন্ধ্যারাত্রে করেছিনু নিঃশেষে সাবাড়,
মধুর আমেজ তার পৃথিবীর সীমা করে পার
নিয়েছিল একেবারে মীর-জাফরের দেহলিতে)।
কিছুটা অচেনা আর কিছু চেনা শহরতলীতে
দেখে তারে সারা মন পূর্ণ হল খুশীর মউজে।
জানি না ক'ঘণ্টা ঠিক সে রাত্রে ছিলাম চোখ বুজে
পুরাপুরি ধ্যানমগ্ন (ছিল না হিসাব সময়ের),
শুনেছি যখন দীর্ঘ কৈফিয়ত মীর-জাফরের!
বলিল সে,
"অদ্ভুত পৃথিবী, যার হাল হকিকত
মূর্খ বা দানেশমন্দ বোঝে নাই কেউ এ যাবৎ;
বোঝে নাই মর প্রাণী; এমনকি ফেরেশতা গোরের
বোঝেনি রহস্য এই দুনিয়ার রাত্রি ও ভোরের,
বিস্ময়ে দেখে সে চেয়ে ওঠা-নামা বিভিন্ন জাতির,
চরিত্র, চাতুর্য, চুক্তি, চক্রান্ত, বিচিত্র ব্যবহার।
"হায়াত দারাজ খান! এসেছো কি দিতে সমাচার
অবোধ্য সে দুনিয়ার কোন এক চক্রব্যূহ থেকে?
অথবা দুর্বুদ্ধি নিয়ে এলে শুধু, যেমন অনেকে
অনর্থক নিয়ে আসে অপযশ বিগত সন্ধ্যার,
এবং আমার কথা কেউ ফিরে করে না প্রচার
পৃথিবীতে! নিতান্ত কদর্থে মীর জাফরের নাম
পরচর্চাকারীদের রসনার বাড়ায় আরাম,
অথচ কখনো জানি প্রতিবাদ হয় নাই এর
কোন দিন!

www.nagorikpathagar.org

"সংক্ষেপে বক্তব্য আমি বলে যাই ফের,
জেনে নিয়ে জানাবে তা পরিচিত মহলে তোমার,
কারণ রচিত পুঁথি রয়েছে যা সম্মুখে সবার
অনেক প্রকৃত তথ কিংবা সত্য পাবে না সেখানে
জাফরের দরবারে জেনে যাবে তুমি যা এখানে।
"পার্থিব লোভের ঊর্ধ্বে বহু দূরে রয়েছি যদিও
তবু মানুষের কাছে উল্টাভাবে আমি স্মরণীয়,
কেননা আমার ত্রুটি কারো আর নাই তো অজানা।
ঐতিহাসিকেরা মিলে এক সাথে খুঁড়েছে বিছানা,
সমাধির শান্তি ভেঙে কোলাহল করেছে সকলে;
সহজে যা চাপা যেতো বলেছে সে কথা দলে দলে।

"ঐতিহাসিকের সাথে যাবতীয় পরচর্চাবিদ
এ ক্ষেত্রে পেয়েছে জানি অন্তরের বিশেষ তাকিদ,
আমার কলঙ্ক ঢাক পেটায়ে খুশীতে নির্বিবাদে
দিয়েছে কলঙ্ক আরো, বলে গেছে দাসত্বের ফাঁদে
আমিই ফেলেছি নাকি লুপ্ত করে জাতির স্বাধীন
অস্তিত্ব বা মুক্ত সত্তা; একা আমি এনেছি দুর্দিন
পূর্ণ সৌভাগ্যের পথে! আজাদী বা আজাদ রাষ্ট্রকে
বিকায়েছি আমি নাকি স্বার্থান্বেষী মতলবের ঝোঁকে।
'বে-ঈমান', 'মুনাফেক' গালাগালি দিয়ে ইত্যাকার
বলেছে আমাকে ওরা 'স্বার্থান্ধ শয়তান', 'কুলাঙ্গার'
কওমের শত্রু নাকি আমি!

"কিছু সত্য মানি
অগত্যা আংশিকভাবে, কিন্তু এ-ও ভালোভাবে জানি,
সর্বনাশের দোষ পুরাপুরি চাপাও এ ঘাড়ে
সে ভীষণ সর্বনাশা এসেছিল আগেই দুয়ারে,
উপলক্ষ এ গরীব। ভিত্তি ছিল আগেই দুর্বল,
সমাজের বুনিয়াদে ধরেছিল আগেই ফাটল
পতনের শেষ চিহ্ন। ভাবেনি যা কেউ কোন দিন
বোঝে নাই ঘুণ-ধরা সমাজের অবস্থা সঙ্গিন

www.nagorikpathagar.org

সুদুর্লভ ব্যতিক্রম মুষ্টিমেয় জ্ঞানীগুণী ছাড়া
মৌতাতে মগ্ন এ জাতি বোঝেনি সে মৃত্যুর ইশারা।

"বিচ্ছিন্ন জনতা হল যে শক্তিতে অচ্ছেদ্য মিল্লাত
যে শক্তিতে কেটে গেল অন্ধকার জুলমাতের রাত,
দীনের সে প্রাণ-শক্তি বোঝে নাই সর্বসাধারণ।
কৌশলী আমীর বাদশা ছিল এর নিগূঢ় কারণ
ব্যক্তিস্বার্থে মগ্ন যারা চায় নাই ইসলামী জামাত,
ক্রমাগত টেনে শুধু নামায়েছে জাতির বরাত।
নিঃসঙ্গ প্রয়াস যত যে কারণে হয়ে গেল শেষ
প্রকৃত আদর্শবাদী অন্ধকারে হল নিরুদ্দেশ!

"হায়াত দারাজ খান! তুমি আমি যাদের ওয়ারিশ,
অন্তত যে দাবী তুলে চাই আজো কিঞ্চিৎ বখশিশ,
কি কারণে নিল তারা জিন্দেগীতে লাঞ্ছনা অশেষ?
কি কারণে এসেছিল আউলিয়া, আলেম, দরবেশ
হেজাজের মাটি থেকে বিজাতীয় হিংস্র পরিবেশে?
তৌহিদের আলো নিয়ে কেন এল অচেনা এ দেশে?
সর্বত্যাগী, সেবাব্রতী চেয়ে কোন রোশনি দীনের
বিগত অধ্যায় হল ইতিহাসে? ...হৃদয়হীনের
চক্রান্তে সে সিলসিলা শেষ হল কিভাবে, কখন
বৈশাখী ঝড়ের রাতে ছায়াপথ মিলায় যেমন
জানো তো সে সব কথা।

"জানো আরো হালুয়া মালাই
চেয়ে কারা দুনিয়ায় আদর্শকে ভেবেছে বালাই,
ভাড়াটিয়া মোল্লা, পীর, পাঠান বা মোগল সরকার
আদর্শের পথে কেন করে নাই যা কিছু দরকার,
বরং প্রশ্রয় দিয়ে বাড়ায়েছে নতুন জঞ্জাল!
জেনে রাখো ব্যঙ্গবিদ দিয়ে গেছে সেই তালে তাল
মীর-জাফরের যুগ। কোরানের মানেনি নির্দেশ,
মিথ্যা ও মৃত্যুর দিকে ছিল জেগে আঁখি নির্নিমেষ
ইবলিসের অনুগত।

www.nagorikpathagar.org

“অতি ধূর্ত আকবর বাদশার
ভাবশিষ্য, চেলা যত ছিল নিয়ে লা-দীনি ব্যাপার।
সমন্বয়-পন্থীদের চিন্তাধারা অথবা বেদাত
বিকায়ে মৌলিক সত্তা এনেছিল আত্মঘাতী রাত।
না মেনে মহান শিক্ষা মুজাদ্দিদ আলফেসানীর
ব্যতিব্যস্ত তরুণেরা ছিল নিয়ে অবৈধ ফিকির।
“বিজাতীয় রমণীর রঙ্গরস হৃদয়ে, মগজে
বিজাতীয় ভাবধারা দিয়েছিল অত্যন্ত সহজে,
বিশেষ রিপুর চক্রে স্থান-ভ্রষ্ট পৌরুষের শিলা
চেয়েছিল রাত্রি দিন অনির্বাণ বৃন্দাবনলীলা,
এবং তা পেয়েছিল সুপ্রচুর স্বর্ণ বিনিময়ে।
মিশ্রণ কাহিনী সেই ভাবি আমি নির্বাক বিস্ময়ে।

“মুক্তপক্ষ শাহবাজ সে নেশায় চড়ুই যেমন
তৌহিদী কালাম ভুলে গেয়েছিল কীর্তন, ভজন।
‘কৃষ্টি সমন্বয়ে’ ফের জন্মেছিল যে রুগ্ন সন্তান
স্বভাবত ছিল তার কাশী কিংবা কিষ্কিন্ধার টান,
মক্কা মদীনার কথা যে কারণে হল তার ভুল;
বিজাতীয় পরিবেশে পেয়েছিল প্রাধান্য মাতুল।
“বহু পৌত্তলিক প্রথা, দুর্নীতি, শোষণ, অবিচার
পালটিয়ে ভোল শুধু ঢুকেছিল ঘরে নির্বিকার
অথবা ধরায়েছিল ঈমানে বা বিশ্বাসে ফাটল,
দিয়েছিল শুধু এনে সংশয়ের আঁধার অতল
ভোলায়ে তৌহিদ জ্ঞান দিয়েছিল দেবতা নূতন
দীনের প্রকৃত তথ্য বোঝে নাই সমাজ তখন।

“সে দিন ভাবের ঘরে করেছিল যারা লেনদেন
তাদের অনেকে জানি এনেছিল মৃত্যু অহিফেন,
বেদান্তের সাথে কেউ খুঁজেছিল পূর্ণ সমন্বয়,
সূফীর খোলসে কেউ এনেছিল মিথ্যা ও সংশয়।
বানপ্রস্থ মেনে নিয়ে জিন্দেগানি কাটায়ে হুজরায়
অনেকে পীরের গদী চেয়েছিল অন্যের মুজরায়,
বংশগত সূত্রে কেউ চেয়েছিল ‘নজর নিয়াজ’;

www.nagorikpathagar.org

মালিকানা সূত্রে কেউ খুঁজেছিল শিষ্য, লাখেরাজ।
রাজনীতিকের মতে সর্ব ক্ষেত্রে দিয়ে মাথা ঝাঁকি
পুরা তেজারতি চালে করেছিল মোল্লারা মোল্লাকি।

"ঐশ্বর্য-বিলাস লুব্ধ মেদপুষ্ট অসংখ্য আলেম
শাসকের ইশারায় সেজেছিল তখন জালেম!
তাদের ক্ষমার দ্বার মুক্ত ছিল রইসের তরে,
ক্ষমাহীন ছিল তারা মিসকিন বা দুঃস্থের উপরে,
বৃহৎ ব্যাপার ছেড়ে অতি ক্ষুদ্র ভগ্ন অংশ নিয়ে
ব্যতিব্যস্ত ছিল তারা মূল সত্যে কদলী দেখিয়ে।

"সে দিন কাবার পথ ছিল জুড়ে অসংখ্য মাজার,
নৃত্য গীত করেছিল কোরানের স্থান অধিকার,
উজ্জ্বল সূর্যের মত ইসলামের মুক্ত মানবতা
বর্ণাশ্রম মেঘে শুধু দেখেছিল বিষম ব্যর্থতা।
উচ্চ নীচ ভেদাভেদ, বহু ক্ষেত্রে বৈষম্য রক্তের
দিয়েছিল ব্যথা প্রাণে মুষ্টিমেয় ইসলাম ভক্তের।
নামত ইসলামী সাম্য মেনে নিয়ে দেখেছি তখন
কার্যক্ষেত্রে ছিল চালু 'মুসলমান শূদ্র বা ব্রাহ্মণ'।

"জীবনের পূর্ণাদর্শ– মূলনীতি ছেড়ে কোরানের
সুবিধাবাদীর পন্থা নেমেছিল অতলে পাপের,
এত্তেবায়ে সুন্নাতের পরিবর্তে শয়তান সেবা
প্রচলিত হয়েছিল বহু কাল ধরে। এ দেশে বা
অন্য কোন দূর দেশে রাষ্ট্রাদর্শ ছিল না সে দিন,
খিলাফতে রাশেদার শেষ চিহ্ন তখন বিলীন
দুনিয়া কারবালা মাঠে শত এজিদের অত্যাচারে।
মজলুমের লোহু ধারা অগণন ফোরাত কিনারে
জমে উঠেছিল, আর সংখ্যাহীন ভুলের পাহাড়
মুসলিম রাষ্ট্রের নামে ছিল জেগে ক্রূর নির্বিকার।

"যদিচ আনন্দ ছিল শাহজাদা, নবাবজাদার
যেমন এখনো আছে, সর্বদাই কিছু অংশ যার
সুনির্দিষ্টভাবে থাকে মোসাহেব ভাগ্যে চিরকাল

www.nagorikpathagar.org

সহস্র সুন্দরী মাঝে বে-সামাল সন্ধ্যা ও সকাল।
যৌন আবেদনে ঘেরা নৃত্যলীলা, শিল্প, অভিনয়
আদর্শ শিক্ষার চেয়ে গ্রহণীয় ছিল সে সময়।
উৎকট লালসা লোভে, ব্যভিচারে উদ্দাম উল্লাসে
সে দিনের অভিজাত মত্ত ছিল সর্পিল উচ্ছ্বাসে।
বলগা-হারা সেই ফুর্তি, নীতিহীন সেই অনাচার
দুনিয়ার বুকে শুধু করেছিল দোজখ গুলজার।

"ঐশ্বর্য অপরিমাণ, বিলাসের সাজ-সরঞ্জাম
যুগিয়েছে সেই যুগে অফুরন্ত খুশীর আঞ্জাম।
অকম্পিত মিহি বস্ত্রে তন্বীদল প্রিয় নগ্ন তনু
দেখিয়েছে অপরূপ সজ্জার বিচিত্র বর্ণধনু
অনুরূপ লেবাসেই নর-রূপী বিলাসী বানর
সদরে, অন্দরে, ঘরে দিয়ে গেছে খুশীর খবর।
অকথ্য, অবর্ণনীয় বিলাসে বা সে রূপ-সজ্জায়
আদ্যোপান্ত এই জাতি মেতেছিল ফুর্তির হাওয়ায়।
ভাবেনি তখন কেউ দেখা দেবে চরম সংঘাত
আনন্দের মধ্যপথে অকস্মাৎ হবে কিশতী মাত।

"আজাদীর যে ভূমিকা– কার্যধারা গঠনমূলক
সে ভূমিকা ছেড়ে কর্মী নিয়েছিল পন্থা রসাত্মক।
হালুয়ার ভা পেয়ে যেমন উদভ্রান্ত কানামাছি
সমগ্র পৃথিবী ভুলে সারাক্ষণ ঘোরে কাছাকাছি,
তেমনি মৌতাতে মগ্ন সে দিনের সব ভাগ্যবান
সকল কর্তব্য ভুলে খুঁজেছিল আনন্দ বিতান।
ছিল যে অবৈধ পাপ গুলিস্তাঁয় সাপের মতন
মারাত্মক বিষ তার কেউ আর বোঝেনি তখন।

"পিতৃপরিচয়হীন সন্তানের বর্ধমান গতি
তখন মহল-প্রান্তে জাগায়েছে দীপ্ত 'শরাফতি'।
অসংখ্য তরুণী বাঁদী মিটায়েছে ধনীর লালসা
জারজ বেড়েছে যাতে 'অভিজাত' গোত্র হতে খসা।
কদর্য সে পঙ্কিলতা গেছে মিশে সমাজ সত্তায়,

পাপের জীবাণু যত গেছে ঘুরে রাত্রির ছায়ায়
বলগা-হারা; উচ্ছৃঙ্খল। ভাবে নাই কেউ পরিণাম
প্রতি বালাখানা ঘিরে জেগেছে যখন জাহান্নাম।

"উত্তরাধিকার সূত্রে পরিবেশ ছিল যা আমার
ছিল না সেখানে রোজা, ছিল শুধু অঢেল ইফ্‌তার,
ছিল না মৌলিক নীতি ইসলামের– সালাত, জাকাত;
ছিল না জেহাদী শক্তি, উখুয়াত, সুদৃঢ় জামাত;
সামাজিক ঐক্যসূত্র শৃঙ্খলার সাথে ছিল দূরে
প্রবৃত্তির পাশবতা ছিল জেগে উচ্ছৃঙ্খল সুরে।
উপরন্তু সমাজের ঊর্ধ্বস্তরে ছিল মুনাফেকী
কৃত্রিম মুখোশে ঢাকা ছিল শুধু অকৃত্রিম মেকী।

"অপদার্থ অযোগ্যের ছড়াছড়ি খান্দানী সুবাদে
কওমের অগ্রগতি রুখেছিল অতি নির্বিবাদে,
চাপা পড়েছিল যাতে পূর্ববর্তী শ্রম ও সাধনা;
নিরুদ্ধ গতির মুখে জমেছিল বহু আবর্জনা।
চরিত্র-বর্জিত জাতি লক্ষ্যভ্রষ্ট কিংবা লক্ষ্যহীন।
খোঁজেনি তখন আর কর্মময় আজাদীর দিন।
সময়ের অপচয়ে কারো প্রাণ হয়নি উদ্বেল,
ঘরে ঘরে ছিল চালু কবুতর, তিতিরের খেল।

"জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা, গবেষণা অথবা সন্ধান
দীর্ঘ যুগযুগান্তর পায় নাই কুত্রাপি সম্মান,
মৌলিক মনন শক্তি বাদ দিয়ে বাঁধা বুলি শিখে
কাটায়েছে কাল শুধু পন্ডিতেরা পাদটিকা লিখে,
যে কারণে দীর্ঘ দিন আবিষ্কার হয়নি নূতন
আলস্য দিয়েছে শুধু আজদাহার কঠিন বাঁধন।
তখন কায়িক শ্রম অভিজাত, শরীফ মহলে
পায়নি প্রশ্রয় কোন, ঘৃণা শুধু পেয়েছে বদলে।

"সে দিন সমাজে শুধু বহুবিধ দুর্নীতির ফাঁদ
মালুম বা বেমালুম ছড়িয়েছে আনন্দ আস্বাদ,
পারেনি যা মুছে দিতে জিন্দা পীর বাদশা আলমগীর,

www.nagorikpathagar.org

যে ফাঁদের গ্রন্থি চিনে দেখিয়েছে ফিরিঙ্গি ফিকির,
নৈলে তার সাধ্য কোথা অর্ধ নগ্ন ধূর্ত সে বেনিয়া
কিভাবে সে নিয়ে গেল খাঁচা সুদ্ধ আজাদীর টিয়া?

"মোগলের যে ঐশ্বর্য আড়ম্বর দু'চোখ ধাঁধানো
দু'দিন পরেই সেটা কেন হল মানুষ কাঁদানো
প্রতিচ্ছায়া ব্যর্থতার? পাকিস্তানী হায়াত দারাজ
পারো যদি ভেবে দেখো ব্যঙ্গোক্তির ছেড়ে কারুকাজ।
ভেবে দেখো অপমৃত্যু কি ফাটলে, কোন পথ দিয়ে
অত্যন্ত সহজে আসে সভ্যতার আলোক নিভিয়ে
অতিশয় দ্রুত গতি।

"অকারণে হয় না পতন,
রহস্য-বিলাসী ছাড়ো অযৌক্তিক কথোপকথন
জেনে নিতে পরিস্থিতি সর্বশেষ অথবা সঠিক;
অন্ধ আবেগের চক্রে বুদ্ধিহীন সেজো না বেল্লিক।
উত্থানের মত জেনো পতনেরও রয়েছে কারণ
পাণ্ডিত্যের কথা নয়, বস্তুত এ জ্ঞান সাধারণ।

"আদর্শের পথ-যাত্রী ও জাতির উত্থান যেমন
আদর্শ হারানো পথে পতনের কাহিনী তেমন
সমান বিস্ময়কর। প্রাণহীন প্রাণীর মতই
আদর্শ হারায়ে জাতি দেখে গেছে শূন্যতা অথৈ!
অথবা নিষ্প্রাণ সেই জড়পি মুর্দার শামিল
বিকায়ে নিজের সত্তা হয়ে গেছে তাল থেকে তিল।

"নিছক 'মুসলিম' নাম শুনে যদি হও বে-চঈন
অনেকের মত হবে অবস্থাটা তোমারো সঙ্গিন
কেননা কঠিন ঠাঁই দুনিয়ার পথে মুনাফেকী
নামের আড়াল টেনে যত্রতত্র চালু রাখে মেকী।
ইসলামবর্জিত সেই ভূমিকাটা দেখ মুসলিমের
বাড়ায়েছে সংখ্যা আর সংজ্ঞা শুধু তথাকথিতের।
যদিচ অনেক মিঞা তৃপ্তি পান মোগলাই বিলাসে
জানেন না এইটুকু মৃত্যু এল সে বিষাক্ত শ্বাসে।

www.nagorikpathagar.org

"আড়ম্বর-প্রিয় জাত অন্তঃসারশূন্য সে বেভুল
হারায়ে বিবেকবুদ্ধি বোঝে নাই এ কথা বিলকুল।
জীবনের পূর্ণাদর্শ বন্ধ রেখে কিতাবে, মসজিদে
বহু আত্মপ্রবঞ্চিত ছিল তৃপ্ত সম্মোহিত নিদে।
জড়তা ও ক্লীবত্বের পরিণতি দেখেছি তখন
জাতির মগজে মনে জগদ্দল পাথর যেমন।

"এ কথা স্বীকৃত সত্য, যে শক্তিতে হল অভ্যুত্থান
সেই শক্তি ছেড়ে ফের মারা গেল 'মুসলিম-সন্তান'।
যে দিন সে ভুলে গেল তৌহিদের প্রদীপ্ত প্রেরণা,
যে দিন প্রবৃত্তি পূজা দিল এনে মিথ্যা আবর্জনা,
যে দিন সে ভুলে গেল ন্যায়, নীতি, সাম্য, সুবিচার।
শ্রমের মর্যাদা, শিক্ষা, অফুরন্ত মূল্য সততার,
সে দিন অলক্ষ্যে তার খুলে গেল মৃত্যুর দুয়ার;
ধ্বংসের জিন্দান-খানা দেখা দিল সম্মুখে সবার।

"সে দিন চলার পথে ক্রমে তার থেমে গেল গতি,
ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কেউ আর বোঝেনি সে ক্ষতি,
দেখেছে নিজের স্বার্থ সকলেই, নিজের কিসমত
চেয়েছে বাড়াতে শুধু কার্যকালে ছাড়েনি বিঘত
তরক্কীর মূলে শুধু হীন স্বার্থ করেছে সন্ধান;
কার্যত সে মুনাফেক পিতা যার ছিল মুসলমান।
যে যার কর্তব্য কাজে ফাঁকি দিয়ে সম্মিলিতভাবে
এনেছিল তারা শুধু অপমৃত্যু ইবলিসি প্রভাবে।

"সে দিন অন্তিম শ্বাস দেখা দিল মোগল শক্তির
সে দিন প্রকাশ পেলো নখ দন্ত স্বার্থান্ধ চক্রীর
কাড়াকাড়ি, হানাহানি তাজ তখত নিয়ে প্রতি দিন
করে গেলো দুশমনের কবজা দৃঢ়, বাসনা রঙ্গিন।
ফিত্না ফসাদের রাজ্য পুরাপুরি দুর্নীতির বাসা
মেটাতে পারেনি আর সংখ্যাহীন লোভীর পিপাসা
স্বার্থশিকারীর চক্র গুপ্ত পাপ অথবা অশেষ
ষড়যন্ত্র রক্তপাত করেছিল কলঙ্কিত দেশ।

www.nagorikpathagar.org

"গদী দখলের দ্বন্দ্ব আত্মঘাতী কলহ, সংঘাত
টেনে এনেছিল শুধু দুর্ভাগ্যের কাল সিয়া রাত।
তৈলহীন শামাদানে ক্ষীয়মাণ সৌভাগ্যের আলো
হারায়ে জীবনীশক্তি যে কারণে আঁধারে মিলালো,
হায়াত দারাজ খান! শতাব্দীর আড়াল এখন
হয়তো অস্পষ্ট বলে মনে হবে সুষ্ঠু সে কারণ
কিন্তু তা অস্পষ্ট নয়।

"স্বার্থের বিষম কদর্যতা
যুগে যুগে এভাবেই টেনে শুধু এনেছে ব্যর্থতা।
খান্নাসের কূট চক্র, ভোজবাজি কিংবা তেলেসমাত
বারেবারে এভাবেই পোড়ায়েছে জাতির বরাত,
সমৃদ্ধির মর্মমূলে অনায়াসে হেনেছে ছোবল
ভ্রাতৃত্ব, আদর্শহীন শেষ হল যে পথে মোগল।

"সে দিন মাতুল বংশ কিংবা যত বিদেশী বণিক
সুযোগ-সন্ধানে যারা ছিল জেগে দৃষ্টি নির্নিমিখ,
সর্বত্র সুবিধা পেয়ে লুব্ধ আরো শিকার সন্ধানে
প্রতি ঝোপে ঝাড়ে তারা ছিল জেগে স্বার্থান্বেষী প্রাণে
লুব্ধ শকুনির মত কিংবা ধূর্ত শৃগালের মত
পতনের শেষ ক্ষণে করেছিল চক্রান্ত সতত।
"আত্মকলহের মাঝে পেয়ে তারা সুবর্ণ সুযোগ
করেনি কসুর কোন দিতে এনে চূড়ান্ত দুর্ভোগ।
ভ্রাতৃ-সমাজের বুকে ক্রমাগত ধরিয়ে ভাঙন
অথবা কলহ কালে দিয়ে কিছু 'বুদ্ধির' ফোড়ন
বহু ক্ষেত্রে জানি তারা হয়েছিল সম্পূর্ণ সফল
পেয়েছিল এই জাতি সরীসৃপ পোষণের ফল।

"সে দিন লোভীর চক্রে ছায়াবাজি রাজ্যে ও মসনদে
সুযোগ-শিকারী যত করেছিল লক্ষ্য প্রতি পদে।
উদ্ধত শাসকগোষ্ঠী সর্বদাই অভ্যস্ত শোষণে
আজাদীর সার্থকতা খুঁজেছিল রক্তপায়ী মনে,

www.nagorikpathagar.org

সুবর্ণ সুযোগ তাই এসেছিল অসংখ্য আমলার
হয়েছিল জনগণ সম্মুখীন কদর্য হালমার।
আমীর, শরীফ যত অকর্মণ্য হেনে বাঁকা ছুরি
শোষণ-পন্থায় শুধু তুলেছিল সে দিন দস্তুরি।
অভ্যস্ত বিলাসে যারা শ্রমকুণ্ঠ, তাদের সন্তান
তৃপ্তিহীন রাত্রি দিন করে গেছে শিকার সন্ধান।

"গরীবের হাড়ে তৈরী হয়েছে তখন ইমারত,
শাহী বালাখানা আর বেশুমার হেরেমের পথ।
কওমের অগ্রগতি হয়েছে তখন চক্র গতি,
অভিনব অর্থ নিয়ে জেগেছে বিকৃত শরাফতি!
ধর্মব্যবসায়ী, পাপী কিংবা ধর্মবহির্ভূত মন
জামাতের পুরোভাগে ইমামতি করেছে তখন
অথবা বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে ঢের ধূর্ত সুচতুর
প্রচুর মুনাফা লুটে ধর্মকেই করেছে ফতুর!
কৌশলী শিকারী যত খেলোয়াড়ী চালে অপরূপ
সিঁদকাঠি না নিয়েও করে গেছে তবিল তসরূপ।
নিতান্ত বেহুঁশ বলে জাতি আর পায়নি সম্বিৎ!
এভাবে কোথায় থাকে চিরস্থায়ী আজাদীর ভিত?

"সর্বশেষ হুঁশিয়ারি মুহাদ্দেস অলীউল্লা শা'র
শোনেনি তখন কেউ বে-খেয়াল কিংবা বে-কারার!
উদ্দাম উল্লাসে মগ্ন, সংজ্ঞাহারা নেশার মউজে
কেউ ছিল মদমত্ত, কেউ ফের ছিল চোখ বুজে!
আদর্শ ভ্রাতৃত্ববাদ, সুমহান মর্যাদা শ্রমের
রাজতন্ত্রে যথারীতি পেয়েছিল ইশারা যমের!
ভূয়া কৌলিন্যের প্রথা হারামের যত আবর্জনা
সমাজ সত্তাকে শুধু হেনেছিল চরম লাঞ্ছনা
যে কারণে এই জাতি হয়েছিল নির্বীর্য দুর্বল;
দুর্ভাগ্যের সাথে তার করেছিল পশরা বদল।

"সমাজ শতধাচ্ছিন্ন, দৈনন্দিন কদর্যতা নিয়ে
তখন বিব্রত ছিল সর্ববিধ দায়িত্ব এড়িয়ে,

www.nagorikpathagar.org

আজাদী রক্ষার তরে প্রয়োজন হয় যে প্রহরা
তন্দ্রাহীন রাত্রি দিন; করেনি সে পথে কেউ ত্বরা।
বরং আচ্ছন্ন কেউ স্বপ্নঘোরে কেউ বা আয়েশে
চেয়েছে কাটাতে দিন, মুগ্ধ রাত্রি অলস আবেশে।
জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা, গবেষণা ধামাচাপা দিয়ে
অগ্রগতিহীন জাতি সহজেই গিয়েছে তলিয়ে।
শতাব্দীর অন্তরালে সে কাহিনী জানো বা না জানো
ব্যর্থতার ইতিকথা এভাবেই রয়েছে সাজানো।

"অযাচিতে খাজনা এসে জমা হত খাজাঞ্চীখানায়
আজাদীর বাজনা শুনে বুদ্ধিজীবী ছিল দো-টানায়
বিবি, বাঁদী, বিরিয়ানি কিংবা নিয়ে কিংখাব মসলিন
আমীর ওমরা যত বোঝে নাই অবস্থা সঙ্গিন।
কাফিয়া, রাদীফ খুঁজে স্বপ্নমুগ্ধ শিল্পী ও শায়ের
শারাবী গজলে মগ্ন পরিস্থিতি পায় নাই টের।
কিঞ্চিৎ প্রাপ্তির লোভে সে দিনের বহু কৃষ্টিসেবী
প্রবৃত্তির তৃপ্তি দিয়ে করেছে প্রচুর মোসাহেবী।
বাঈজীর বাজুবন্দে বন্দী সেই যুগের তরুণ
নেয়নি দায়িত্ব কোন অতিরিক্ত ঈশকের দরুন।
নর্তকীর লাস্য-লীলা তৃপ্তি তাকে দিয়েছিল, আর
বংশ গৌরবের তৃপ্তি ছিল প্রাণে শরীফজাদার।

"কৃত্রিম সৌজন্যে ঢাকা সে দিনের সব প্রবঞ্চক
স্বার্থ সুবাদেই শুধু হয়েছিল বিশ্বাসঘাতক।
উন্নত আদর্শ মুখে কিন্তু ছুরি বগলতলায়
এ ছবি সুলভ ছিল সে যুগের উঁচু মহলায়।
নেকড়ে, চিতা ছিল যত খুঁজেছিল সে দিন সুযোগ
ত্বরান্বিত হয়েছিল খান্নাসের কুমন্ত্রে দুর্ভোগ।

"সুযোগ-সন্ধানকারী ছিলাম যে, নাই তাতে ভুল,
এ কথা বোলো না শুধু কূল আমি করেছি নির্মূল।
এ জাতি পোড়ায়েছিল নিজ হাতে নিজের তকদির,
নীতি ও সততা ছেড়ে ধরেছিল রাহা দুর্নীতির,

www.nagorikpathagar.org

সাম্য ভ্রাতৃত্বের পথে যেতে কেউ চায়নি সহজে;
ইবলিসের কারখানা ছিল চালু অসংখ্য মগজে।

"মরণের মুখোমুখি অথবা চরম দুর্বিপাকে
যে শক্তি বাঁচাতে পারে ঘূর্ণমান মুসলিম সত্তাকে
পরিপূর্ণ সে আদর্শ, ছেড়ে সেই শাশ্বত ইসলাম
সে দিন বিভ্রান্ত প্রাণ ছিল নিয়ে স্বার্থ বা আরাম।
নিশ্চিত সাফল্য ছেড়ে, আদর্শের প্রাণশক্তি ভুলে
এসেছিল পথভ্রষ্ট দুর্নীতির মৃত্যু উপকূলে।

"রুগ্ন ঈমানের সাথে জেগেছিল তিক্ত অবিশ্বাস
হীন স্বার্থে আজাদীর উঠেছিল ক্লান্ত নাভিশ্বাস
অনিবার্য পতনের শেষ চিহ্ন ফুটেছে যখন
কিভাবে সে রোগী নিয়ে পাড়ি দেবে জাফর তখন?
প্রাণহীন সভ্যতার বহিরঙ্গ করে কোন দিন
কাটাতে পেরেছে তার সর্বনাশা ধ্বংসের সঙ্গিন?

"আদতে যে যক্ষ্মারোগী, বহু মূল্য তার বহির্বাস
দিতে পারে কতটুকু প্রাণ-দীপ্ত বলিষ্ঠ আশ্বাস?
প্রাচীন স্থাপত্য, শিল্প কতটুকু লাগে তার কাজে?
হয় না কি হাস্যকর প্রতি মনে পরিত্যক্ত সাজে
সেই ব্যাধিগ্রস্ত সত্তা? পায় না কি সে মৃত্যু লিপিকা?
এ ক্ষেত্রে ধ্বংসের দূত জাগে না কি ভ্রান্ত অহমিকা?
কিসসা কাহিনীতে লেখা স্ফীত সেই ব্যাঙের মতন
হয় না কি অহঙ্কার শুধু অপমৃত্যুর কারণ?
তবুও বিভ্রান্ত সত্তা বাঁচাতে সে প্রাণহীন ঠাট
পঙ্কিল পাপের পথে করে যায় তবিল লোপাট।

"ধ্বংসের সম্মুখে এসে সে যুগের শাসকপ্রধান
চেয়েছিল এ পন্থায় ফিরে পেতে ঐশ্বর্য সম্মান!
দুঃস্থ রায়তের পরে চাপিয়ে রাজস্ব গুরুভার
গদীনশীনেরা যত চেয়েছিল আনন্দ অপার,
প্রজার সর্বস্ব কেড়ে চেয়েছিল বাড়াতে সম্বল;
প্রতিদানে পেয়েছিল রায়তের অনাস্থা কেবল

www.nagorikpathagar.org

ইসলামের মূল নীতি যথারীতি ছিল বহু দূরে
পায়নি সান্ত্বনা কেউ দুর্নীতির আত্মঘাতী সুরে।

"আদর্শের প্রাণশক্তি নিয়ে জাতি হয় অগ্রসর
অথবা আদর্শ ছেড়ে পৌঁছে যায় যেখানে কবর,
মীর-জাফরের দিনে এসেছিল শেষের অধ্যায়,
সত্য বা ন্যায়ের পথে জেগেছিল অসত্য, অন্যায়,
দুর্নীতি ও মুনাফেকী মুক্ত গতি পেল যে কারণে
জবানে ঘোষিত নীতি কার্যক্ষেত্রে এল না জীবনে
আদর্শের কথা ছিল সেই যুগে নিছক কেতাবী,
জাতির পতন তাই হলো জানি কিঞ্চিৎ সেতাবী।

"প্রখ্যাত গাল্পিক রূপে পরিচিত যারা চতুর্দিকে
মূল সত্য বাদ দিয়ে কাহিনীটা করে দেয় ফিকে
কার্যটাই খোঁজে তারা বাদ দিয়ে নিগূঢ় কারণ
অতঃপর সে মতেই সায় দেয় সর্বসাধারণ
নিরীহ সে মেষপাল চালকের ইঙ্গিতে নির্বোধ
পরিতৃপ্ত অজ্ঞতায় পায় খুঁজে চিন্তার রসদ।
অথবা সরলমতি মক্তবের পড়ুয়া যেমন
বুদ্ধিহীন, গ্রাস করে শিক্ষকের কথোপকথন
তেমনি নির্বোধ ওরা; শক্তি নাই মৌলিক চিন্তার!
মিথ্যা প্রচারণা শুধু খুলে দেয় ভ্রান্তির দুয়ার।
অথচ সঠিক তথ্য চিরদিন থাকে ধামাচাপা,
সুযোগে চোরের মাল চুরি করে মাপে আলিবাবা,
কল্পিত কাহিনী বাড়ে এ ভাবেই আলিফ লায়লার
প্রকৃত ব্যাপারে যেটা কার্যকালে পায় না সে পার।

"বাঘ বা সিংহের বাচ্চা বাঘ সিংহ হয় সর্বকালে
অসংখ্য নমুনা পাবে খোলা চোখে দু'পাশে তাকালে,
আকৃতি, প্রকৃতি গুণে হয় না কখনো বিপরীত,
কিন্তু মানুষের ঘরে এ ঘটনা ঘটে কদাচিত;
সামঞ্জস্য থাকে বটে পুরাপুরি বাহ্যিক আকারে
বৈপরীত্য ধরা পড়ে চরিত্র বা গুণের বিচারে।

www.nagorikpathagar.org

মর্দে মুজাহিদ পিতা কিন্তু পুত্র খাঁটি মুনাফেক
অত্যন্ত সহজে পাবে এবম্বিধ নমুনা অনেক।

"ঝাণ্ডা খাড়া রেখেছিল দীর্ঘ কাল যারা আজাদীর
যাদের চরিত্র, নীতি এখনো বিস্ময় ধরণীর
সভ্যতার মূলে দান সবচেয়ে উন্নত যাদের,
আজাদী বিকালো জেনো অপদার্থ সন্ততি তাদের।
কেননা ওয়ারিশী সূত্রে পরিত্যক্ত তৈজসের মত
শিক্ষা বা চরিত্রগুণ করায়ত্ত হয় না অন্তত।
নিষ্ফল প্রবাদবাক্য প্রতারণা করে আগাগোড়া
পুরো না পেলেও নাকি পায় কিছু সিপাহীর ঘোড়া,
কিন্তু আমাদের ভাগ্যে ঘটে নাই কোন প্রাপ্তিযোগ
দুর্নীতির খেলা শুধু দিল এনে চূড়ান্ত দুর্ভোগ।

"জেহাদী তরিকা ছেড়ে দীক্ষা নিয়ে 'সহজিয়া' পথে
প্রাপ্য যা পেল এ জাতি এক দিন নিজের কিসমতে।
নৈতিক স্বপন আর চারিত্রিক দীনতা অশেষ
ফিরিঙ্গী ডাকুর হাতে তুলে দিল স্বাধীন স্বদেশ
তারপর ডুবে গেল নৈরাশ্যের পাথারে অকূলে।
সে পাপ অথবা দোষ নয় এক জাফরের ভুলে
বহু গুণে যোগ্যতর কিংবা যদি আরো শক্তিমান
সেদিন নেতৃত্ব নিত হত না সে মুশকিল আসান।

"মীর-জাফরের যারা সহযোগী সহকর্মী আর
আজাদীর ফলভোগী নারী বা পুরুষ নির্বিকার,
রাষ্ট্রের বাসিন্দা যত জ্ঞানপ্রাপ্ত কিন্তু উদাসীন
আজাদী রক্ষার পথে; এনেছিল একত্রে দুর্দিন।
নৈলে এক জাফরের এই শক্তি ছিল না অন্তত
সকলের স্বাধীনতা মুছে ফেলে শয়তানের মত।
হারায়ে চরিত্রশক্তি ডোবে জাতি উদ্ভ্রান্ত যখন
বাঁচানো অসাধ্য জেনো সেই মৃগীরোগীরে তখন।

"কি থাকে চরিত্র গেলে? চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হারালে
কি থাকে এ পৃথিবীতে? সর্ব ক্ষেত্রে তাল দিয়ে তালে

www.nagorikpathagar.org

স্বকীয় স্বভাব ভুলে প্রতিক্ষণে বিবর্তিত রূপে
অপমান, অপমৃত্যু আনে না কি ডেকে চুপে চুপে
মেরুদ-হীন সেই রুগ্ন জাতি অথর্ব, দুর্বল?
সর্বহারা হয় না কি যে হারায় চরিত্রের বল?
মীর-জাফরের দোষ হতে পারে এ ক্ষেত্রে ততটা
ব্যক্তিগত অপরাধে অপরাধী ছিল সে যতটা।

"সর্বাংশে আমাকে টেনে দোষী করা, ভুল বাস্তবিক,
ঐতিহাসিকেরা শুধু করে কাজ অনৈতিহাসিক,
হামেশা দশের বোঝা চাপা দিয়ে একের গর্দানে
দীর্ঘ শতাব্দীর শেষে কর্ণমূল ধরে ফের টানে।
অন্যের সুলভ কানে পেয়ে পূর্ণ আনন্দ নিষ্কাম
কর্ণমর্দনের খেলা পণ্ডিতেরা খেলে অবিশ্রাম!
এবং অসহ্য যেটা সে কথাই বলি আমি আজ
বহু পরচর্চাবিদ অকারণে করে উক্ত কাজ,
প্রদীপ্ত উৎসাহে ধরে বে-ঈমানী মীর-জাফরের
এ যুগের কীর্তিমান কণ্ডুয়ন মেটায় মনের।

"তাজ্জব ব্যাপার বটে!... বক্রগতি এই পৃথিবীর
চক্রান্তে জাহির হয় গুপ্ত পাপ অথবা ফিকির!
যেখানে ঘটনা শেষ কিসসা শুরু হয় সেখানেই
আতিশয্য ছাড়া আর যে গাথায় নূতনত্ব নেই,
তবু তার জের টেনে অকারণে ছড়িয়ে জঞ্জাল
মূর্খ বা দানেশমন্দ কুৎসা গায় সকাল বিকাল।"

www.nagorikpathagar.org

এক নজরে সিরাজউদ্দৌলার শাসনামলের ঘটনাসমূহ

৯ এপ্রিল, ১৭৫৬ সাল

নবাব আলীবর্দী খানের মৃত্যু। বাংলার মসনদে নবাব সিরাজউদ্দৌলার আরোহণ। সিরাজউদ্দৌলার বয়স তখন মাত্র তেইশ বছর।

১৭৫৬ সালের এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ

ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের অজুহাতে বাংলায় ইংরেজ ও ফরাসীদের দুর্গ নির্মাণ। নবাবের আদেশ ফরাসী দুর্গ নির্মাণ অব্যাহত থাকে।

১৬ মে ১৭৫৬ সাল

বিদ্রোহী শওকত জঙ্গকে দমনের উদ্দেশ্যে পূর্ণিমায় নবাব সিরাজউদ্দৌলার সামরিক অভিযান।

২০ মে ১৭৫৬ সাল

নবাব সিরাউদ্দৌলার কাছে গবর্ণর ড্রেকের চিঠি প্রেরণ। চিঠিতে দুর্গ নির্মাণ বন্দের কোনো উল্লেখ নেই।

১৬ জুন ১৭৫৬ সাল

ক্রুদ্ধ নবাব সিরাউদ্দৌলা পুর্ণিয়া না গিয়ে মর্শিদাবাদে ফিরে এলেন। কলকাতায় ইংরেজদের দমনের উদ্দেশ্যে সসৈন্যে যাত্রা। পথে কাশিবাজার কুঠি দখল।

২০ জুন ১৭৫৬ সাল

কলকাতার দুর্গ নবাব সিরাজউদ্দৌলার দখলে। গভর্নর ড্রেক ও অন্যান্য ইংরেজের পলায়ন। গভর্নর হলওয়েলের আত্মসমর্পণ। কলকাতার পতনের পর ড্রেক ও অন্যান্য ইংরেজের টিকে থাকতে সহায়তা দেন প্রভাবশালী হিন্দু উমিচাঁদ, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, মানিকচাঁদ, নন্দকুমার প্রমুখ।

www.nagorikpathagar.org

১৬ অক্টোবর ১৭৫৬ সাল

পুর্ণিয়ার নবাবগঞ্জে বিদ্রোহী শওকত জঙ্গের সঙ্গে নবাব সিরাজউদ্দৌলার যুদ্ধ। যুদ্ধে শওকত জঙ্গ পরাজিত ও নিহত।

১৫ ডিসেম্বর ১৭৫৬ সাল

মাদ্রাজ থেকে রবার্ট ক্লাইভ ও এডমিরাল ওয়াটসনের অধীনে একদল সৈন্যের কলকাতা আগমন ও ড্রেক এর সাথে যোগদান।

২৭ ডিসেম্বর ১৭৫৬ সাল

ইংরেজ সৈন্য ও নৌবহরের কলকাতা অভিমুখে যাত্রা।

২ জানুয়ারী ১৭৫৭ সাল

মানিকচাঁদের বেঈমানী। ইংরেজদের কলকাতা পুনর্দখল।

৩ জানুয়ারী ১৭৫৭ সাল

দখলদার ইংরেজ বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে নবাব সিরাজউদ্দৌলার কলকাতা অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা।

১০ জানুয়ারী ১৭৫৭ সাল

রবার্ট ক্লাইভ হুগলি শহর দখল করে লুটতরাজ শুরু করে। পার্শ্ববর্তী গ্রাম জনপদ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়।

১৯ জানুয়ারী ১৭৫৭ সাল

নবাব সিরাজউদ্দৌলার হুগলি আগমন। ইংরেজদের কলকাতা প্রস্থান।

৩ ফেব্রুয়ারী ১৭৫৭ সাল

নবাব সিরাজউদ্দৌলার কলকাতার শহরতলীর আমির চাঁদের বাগানে শিবির স্থাপন করেন।

৫ ফেব্রুয়ারী ১৭৫৭ সাল

নবাব সিরাজউদ্দৌলার শিবির আক্রমণ করে ক্লাইভ ও ওয়াটসন শেষ রাতে। সিরাজবাহিনী পাল্টা আক্রমণ চালালে ক্লাইভ পিছু হটেন।

www.nagorikpathagar.org

৯ ফেব্রুয়ারী ১৭৫৭ সাল

নবাব সিরাজউদ্দৌলার সাথে ইংরেজদের আলী নগরের সন্ধি হয়।

২৩ মার্চ ১৭৫৭ সাল

ক্লাইভ কর্তৃক ফরাসী ঘাঁটি ও বাণিজ্য কেন্দ্র চন্দন নগর দখল।

২৩ জুন ১৭৫৭ (পলাশীর যুদ্ধ)

ভাগীরথী নদীর তীরে পলাশীর প্রান্তরে নবাব সিরাজউদ্দৌলার বাহিনীর সাথে রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে ইংরেজ বাহিনীর যুদ্ধ যুদ্ধ নামক এক প্রহসন আয়োজিত হয়। জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ, মানিকচাঁদ, নন্দকুমার, মীর জাফর আলী খান প্রমুখের ষড়যন্ত্রে সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজদের হাতে পরাজিত হন।

২৯ জুন ১৭৫৭ সাল

মীর জাফরের সিংহাসনে আরোহন। তিনি ১৭৬০ সাল পর্যন্ত পুতুল নবাব হিসেবে ক্ষমতায় ছিলেন। তারপর ইংরেজদের সহায়তায় তার জামাতা মীর কাশেম সিংহাসনে আরোহণ করেন। এর তিন বছর পর মীর জাফর পুনরায় নবাব হন। মীর কাশিমের সাথে ইংরেজদের বেশ কয়েকবার যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মীর কাশিম পরাজিত হন। সর্বশেষ ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মীর কাশিম নিরুদ্দেশ হয়ে যান।

৩০ জুন ১৭৫৭ সাল

নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে ভগবান গোলায় গ্রেপ্তার করা হয়।

২-৩ জুলাই, ১৭৫৭

শৃঙ্খলিত অবস্থায় নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে মুর্শিদাবাদে আনয়ন। ৩ জুলাই রাতে মীর জাফরের পুত্র মীরণের আদেশে ঘাতক মোহাম্মদী বেগের তরবারীর আঘাতে নবাব সিরাজউদ্দৌলা শাহাদাৎ বরণ করেন।

www.nagorikpathagar.org

সংশ্লিষ্ট কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, স্থান, ব্যক্তি

১. আলীনগরের চুক্তি
২. অ্যাডমিরাল চার্লস ওয়াটসন
৩. উইলিয়াম ওয়াটস
৪. উত্তমাশা অন্তরীপ
৫. উমি চাঁদ
৬. ইন্ডিয়া অ্যাক্ট (১৮৫৮ খ্রি.)
৭. ইস্ট ইন্ডিয়া হাউস
৮. ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৩২-১৮১৮ খ্রি.)
৯. কর্ণেল জন বিল প্যাট্রিক
১০. কর্ণেল ষ্ট্রিংগার লরেন্স
১১. কাশিমবাজার
১২. কাশিমবাজার বাজ
১৩. ক্যাপ্টেন উইলিয়াম হকিন্স
১৪. ঘসেটি বেগম
১৫. চন্দননগর
১৬. চার্টার অ্যাকট
১৭. চার্লস স্টুয়ার্ট (১৬৬৪-১৮৩৭ খ্রি.)
১৮. চুঁচূড়া, ওলন্দাজ উপনিবেশ
১৯. জগৎ শেঠ
২০. জন জেফেনিয়াহ হলওয়েল (১৭১১-১৭৯৮ খ্রি.)
২১. জন সুরম্যান
২২. জব চার্ণক (১৬৩০-১৬৯২ খ্রি.)
২৩. জেমস রেনেল (১৭৪২-১৮৩০ খ্রি.)
২৪. ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি
২৫. ডেনিস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি
২৬. দস্তক
২৭. পর্তুগীজ বণিক
২৮. ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি
২৯. ফোর্ট উইলিয়াম

www.nagorikpathagar.org

৩০. ফোর্ট সেন্ট ডেভিড
৩১. ফোর্ট সেন্ট জর্জ
৩২. ফ্রাঙ্কোইস কারোন
৩৩. বোর্ড অব ট্রেড
৩৪. ভাস্কো ডা গামা
৩৫. মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় (১৭১০-১৭৮৩ খ্রি.)
৩৬. মিরণ
৩৭. মোহন লাল
৩৮. মুর্শিদাবাদ
৩৯. মীরজাফর আলী খান
৪০. মীর মদন
৪১. যশেপ ফ্রাঙ্কাইস ডুপ্লে
৪২. রজার ড্রেক
৪৩. রবার্ট ওর্ম
৪৪. রবার্ট ক্লাইভ
৪৫. রালফ ফিচ
৪৬. সাবাত জং
৪৭. স্যার আয়ার কুট (১৭২৫-১৭৮৩ খ্রি.)
৪৮. স্যার উইলিয়াম হেজেস (১৬৩২-১৭০১ খ্রি.)
৪৯. স্যার জর্জ অকসেনডেন
৫০. স্যার জসিয়া চাইল্ড
৫১. স্যার টমাস রো
৫২. হেনরী ভান্সিটার্ট (১৭৩২-১৭৭০ খ্রি.)

www.nagorikpathagar.org

ফোর্ট উইলিয়ামের প্রেসিডেন্ট ও গভর্নরদের নামের তালিকা (১৭০০-১৭৫৭ খ্রি.)

১. স্যার চার্লস আয়ার	২৬শে, ১৭০০-৭ জানুয়ারি, ১৭০১।
২. জন বিয়ার্ড	৭ জানুয়ারি, ১৭০১-৭ জুলাই, ১৭০৫।
৩. এন্টনি ওয়েন্টডেন	২০ জুলাই, ১৭১০।
৪. জন রাসেল	৪ মার্চ, ১৭১১।
৫. রবার্ট হেজেস	৩ ডিসেম্বর, ১৭১৪–২৮ ডিসেম্বর, ১৭১৭।
৬. স্যামুয়েল ফীক	১২ জানুয়ারি, ১৭১৮।
৭. জন ডীন	১৭ জানুয়ারি, ১৭২৩।
৮. হেরী ফ্রাঙ্কল্যান্ড	৩০ জানুয়ারি, ১৭২৩।
৯. এডওয়ার্ড স্টিফেনসন	১৭ সেপ্টেম্বর, ১৭২৮।
১০. জন ডীন	১৮ সেপ্টেম্বর, ১৭২৮।
১১. জন স্ট্যাক হাউস	২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৭৩২-২৯ জানুয়ারি।
১২. টমাস ব্রাডিল	২৯ জানুয়ারি, ১৭৩৯-৪ ফেব্রুয়ারি, ১৭৬৪।
১৩. উইলিয়াম বারওয়েল	১৮ এপ্রিল-১৭ জুলাই, ১৭৪৯।
১৪. এ্যাডাম ডাওসন	১৭ জুলাই, ১৭৪৯ - ৫ জুলাই, ১৭৫২।
১৫. উইলিয়াম ফিটকে	৫ জুলাই - ৮ আগষ্ট, ১৭৫২।
১৬. রজার ড্রেক (জুনিয়র)	৮ আগষ্ট, ১৭৫২ - ২২ জুন, ১৭৫৮।

(বিয়ার্ডের পর প্রেসিডেন্ট পদে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই একজন নতুন সমাসীন হতেন। ১৭০৪ থেকে ১৭০৯ পর্যন্ত এভাবে সরকার চালু ছিল।)

www.nagorikpathagar.org

বাংলা সাহিত্যে পলাশী

বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাস তছনছকারী কুখ্যাত পলাশী প্রসঙ্গটি বাংলা সাহিত্যে যতটা গুরুত্বের সাথে আলোচিত ও পর্যালোচিত হওয়া আবশ্যক ছিল ততটা হয়নি। এটি একটি জাতির জন্যে চরম দুর্ভাগ্যের বিষয়। যে জাতি তার নিজের ইতিহাস উপেক্ষা করে চলে সে জাতি বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না।

বাংলা সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার অর্জনকারী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনায় পলাশী প্রসঙ্গটি অনেকটাই উপেক্ষিত। পলাশী উপেক্ষিত হয়েছে অন্যান্য বিখ্যাত সাহিত্যিকের সাহিত্যকর্মেও। অবশ্য ব্যতিক্রম আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) এবং কয়েকজন নাট্যকার যেমন গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯২২), শচীন সেন গুপ্ত, সিকান্‌দার আবু জাফর (১৯১৮-১৯৭৫) প্রমুখ। পলাশী সম্পর্কিত কয়েকটি বই-পুস্তকের নাম যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে-যেগুলোর অধিকাংশই আবার ইতিহাস বিকৃতিরই নামান্তর। **(সিরাজের চরিত্র হননকারী করা অধ্যায় দ্র.)**

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সুবিখ্যাত 'কান্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতায় জাতীয় মুক্তির টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে দেখেছেন পলাশীকে। কবিতাটির সংশ্লিষ্ট অংশ নিম্নরূপ–

> কাণ্ডারী! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর,
> বাঙালীর খুনে লাল হ'ল যেথা ক্লাইবের খঞ্জর!
> ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায়, ভারতের দিবাকর!
> উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়ে পুনর্বার॥

বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার শাহাদাত দিবস ৩ রা জুলাইকে নবাব সিরাজউদ্দৌলা স্মৃতি দিবস হিসেবে পালনের জন্যে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে গেছেন। ১৯৩৯ সালের ২৯ শে জুলাই দৈনিক আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল কাজী নজরুল ইসলামের ঐতিহাসিক সেই আহ্বান-বাণী যা নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল-

www.nagorikpathagar.org

'কবি নজরুল ইসলাম
সিরাজ স্মৃতি উদযাপনের আহ্বান
'বীর শহীদের জীবনস্মৃতি হইতে শিক্ষা লাভ করুন'

আগামী ৩রা জুলাই সিরাজউদ্দৌলা স্মৃতি দিবস পালনের জন্য যে আয়োজন হইতেছে, সে সম্পর্কে বাংলার বুলবুল কবি কাজী নজরুল ইসলাম নিম্নরূপ আবেদন প্রচার করিয়াছেন :

'আমি জানিতে পারিলাম যে, আগামী ৩রা জুলাই সিরাজউদ্দৌলা দিবস পালনের আয়োজন চলিতেছে। একথা আজ সর্বজনসম্মত যে বাংলার শহীদ বীর ও শেষ স্বাধীন নৃপতি নওয়াব সিরাজউদ্দৌলা রাজনৈতিক কোলাহলের ঊর্দ্ধে। হিন্দু মুসলমানের প্রিয় মাতৃভূমির জন্য নওয়াব সিরাজউদ্দৌলা সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। সর্বোপরি বাংলার মর্যাদাকে তিনি ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়াছিলেনএবং বিদেশী শোষণের কবল হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য আপনার জীবন যৌবনকে কোরবানি করিয়া গিয়াছেন।

মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ-ও নেতৃত্বে কলিকাতার সিরাজউদ্দৌলা স্মৃতি কমিটি উক্ত অনুষ্ঠানকে সাফর‍্যমন্ডিত করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। কলিকাতা কমিটিকে সর্বপ্রকারে সাহায্য প্রদান করিয়া আমাদেও জাতীয় বীরের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিবার জন্য আমি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের নিকট আবেদন জানাইতেছি। বিদেশীর বন্ধন-শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভের জন্য আজ আমরা সংগ্রামে রত। সিরাজউদ্দৌলর জীবনস্মৃতি হইতে যেন আমরা অনুপ্রাণিত হই-ইহাই আমার প্রার্থনা।' *(দৈনিক আজাদ, ২৯ শে জুন ১৯৩৯)*

ডসরাজের প্রতি জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের অসীম মুগ্ধতা লক্ষ করা গেছে সবসময়। স্মরণ করা যেতে পারে, বিখ্যাত নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের (১৮৯২-১৯৬১) 'সিরাজউদ্দৌলা' রেকর্ড-নাট্যের গানগুলো লিখে দিয়েছিলেন। গানগুলো নিম্নরূপ–

১. আমি আলোর শিখা
২. কেন প্রেম-যমুনা আজি হল অধীর
৩. পথহারা পাখি কেঁদে ফিরি একা
৪. একূল ভাঙে ওকূল গড়ে এই তো নদীর খেলা
৫. হায় পলাশী!

www.nagorikpathagar.org

পলাশী বিষয়ক নাটক

বিয়োগান্তক ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে বেশ কয়েকটি নাটক রচিত হয়েছে। যেগুলোর মধ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শচীন সেন গুপ্ত এবং সিকান্দার আবু জাফর রচিত তিনটি নাটক বিশেষ গুরুত্ব রাখে। এ তিনজন নাট্যকারের মধ্যে সিকান্দার আবু জাফর রচিত সিরাজউদ্দৌলা নাটকটি সবচেয়ে ইতিহাসঘনিষ্ঠ এবং নির্ভরযোগ্য হিসেবে সকল মহলে সমধিক সমাদৃত।

সিকান্দার আবু জাফরের রচনার পূর্বে বাংলা রঙ্গমঞ্চের জন্য সিরাজউদ্দৌলা বিষয়ে আরো কয়েকখানি নাটক রচিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো– ১. গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২) রচিত সিরাজউদ্দৌলা নাটক। ৫ অঙ্কের এবং ৩৬টি দৃশ্যের এই নাটক গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচনা করেছেন ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনের সময়। ১৯০৬ সালে নাটকটি প্রকাশিত হয়। ১৯১১ সালের ৮ জানুয়ারি তারিখে তৎকালীন সরকার সিরাজউদ্দৌলা নাটকের অভিনয় ও প্রচার বন্ধ করে দেয়।

সিরাজউদ্দৌলা নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার গিরিশ ঘোষ বলেছেন–

> *বিদেশী ইতিহাসে সিরাজ চরিত্র বিকৃত বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি শিক্ষিত সুধিগণ অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে বিদেশী ইতিহাস খ-ন করিয়া রাজনৈতিক ও প্রজাবৎসল সিরাজের স্বরূপ চিত্র প্রদর্শনে যত্নশীল হন। আমি ঐ সমস্ত লেখকগণের নিকট ঋণী।*

সিরাজউদ্দৌলা বিষয়ক দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য নাটকটি রচনা করেন শচীন সেনগুপ্ত। বস্তুতপক্ষে শচীন সেনগুপ্তের সিরাজউদ্দৌলা বাংলার রঙ্গমঞ্চে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নাটক। এ নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় ২৯ জুন ১৯৩৮ সালে।

নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত বলেছেন–

> ইতিহাস ঘটনাপঞ্জি। নাটক তা নয়। ঐতিহাসিক লোকের ঘটনাবহুল জীবনের মাত্র একটি ঘটনা অবলম্বন করেও একাধিক নাটক করা যায়। এইজন্য যে, ঘটনাটি ঘটাবার কারণই নাট্যকারের বিষয়বস্তু।

www.nagorikpathagar.org

রাজনীতিক যে পরিস্থিতিতে সিরাজ বিব্রত ও বিপন্ন হয়েছিলেন, বহু দেশের বহু নরপতিকে সেইরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। কেউ তা অতিক্রম করে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন, কেউ তা পারেননি। এইখানেই তাঁর স্বভাবের, তাঁর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের কথা এসে পড়েছে। সেইখানেই রয়েছে নাটকের কাজ।

আমি এই (সিরাজ) চরিত্র বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেয়েছি, সিরাজের মতো উদার স্বভাবের লোকের পক্ষে, তাঁর মতো তেজস্বী, নির্ভীক, সত্যাশ্রয়ী তরুণের পক্ষে কুচক্রীদের ষড়যন্ত্র জাল ছিন্ন করা সম্ভবপর নয়। বয়স যদি তাঁর পরিণত হত, কূটনীতিতে তিনি যদি পারদর্শী হতেন, তাহলে মানুষ হিসেবে ছোট হয়েও শাসক হিসেবে তিনি হয়তো বড় হতে পারতেন। সিরাজের অসহায়তা, সিরাজের পারদর্শিতা, সিরাজের অন্তরের দয়া দাক্ষিণ্যই তাঁকে তাঁর জীবনের শোচনীয় পরিণতির পথে ঠেলে দিয়েছিল। তাঁর অক্ষমতাও নয়, অযোগ্যতাও নয়। অধিকাংশ বাঙালির চরিত্রেরই এই বৈশিষ্ট্য। সিরাজ ছিলেন খাঁটি বাঙালি। তাই তাঁর পরাজয়ে বাংলার পরাজয় হল। তাঁর পতনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালিও হল পতিত।

শচীন সেনগুপ্তের সিরাজউদ্দৌলা ৩ অঙ্কে ৯ দৃশ্যের নাটক। এ নাটকে ইতিহাসের তথ্য যেমন আছে তেমনি ইতহাসের সম্ভাবনাসিদ্ধ কাল্পনিক চরিত্রের সমন্বয়ও ঘটেছে। তৎকালীন বাঙালির দেশপ্রীতির সঙ্গে সিরাজের দেশ্রপ্রেমের সম্মেলন সাধন করে নাট্যকার সিরাজউদ্দৌলাকে বাঙালি জাতির নায়করূপে নির্ণয় করেছেন।

সিকান্‌দার আবু জাফরের সিরাজউদ্দৌলা নাটকটি ৪ অঙ্কে ১২টি দৃশ্যে রচিত। এ নাটকটি রচনা প্রসঙ্গে নাট্যকার বলেছেন–

এক যুগের ইতিহাসের কাছ থেকে পরবর্তী যুগ নানা জ্ঞানের পাঠ গ্রহণ করে। এই পাঠগ্রহণ সার্থক হয় না ইতিহাস অখ- সত্য-নির্ভর না হলে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে এক একটি জাতি যুগের সীমানা অতিক্রম করে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা এবং প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখবার জন্যে ইতিহাসকে খুশিমত নির্মাণ করে গেছে; অথবা তাদের স্বার্থানুযায়ী ইতিহাস নির্মিত হওয়ার মত পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। ফলে অসংখ্য অসত্যের স্তুপে সত্যের হয়েছে সমাধি। নূতন নূতন কণ্ঠে অসত্য নূতন নূতন সুরে ঝঙ্কৃত হয়েছে। জমে উঠেছে

www.nagorikpathagar.org

বিভ্রান্তির পাহাড়। ইতিহাস নির্মাণের এই কৌশলে ইংরেজের দক্ষতা বিস্ময়কর। দূরদর্শিতা, অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্যে সজাগ তৎপরতা, ক্লান্তিহীন প্রচেষ্টা, নির্লজ্জ চাতুরী প্রভৃতির সমন্বয়ে তারা তাদের স্বার্থানুযায়ী ইতিহাস অনেকের দ্বারা লিখিয়াছে (শক্তি প্রয়োগে নয়– তাদের কৌশল-সৃষ্ট পরিবেশের বিভ্রান্তিতে উদ্বুদ্ধ করে) এবং জনসাধারণকে তা যথাসম্ভব বিশ্বাসও করিয়েছে। আমাদের ইতিহাসে সিরাজউদ্দৌলার নামটি কলঙ্ক এবং নৃশংসতার সঙ্গে সমার্থবোধক করে তোলা ইংরেজের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কীর্তি।

শাঠ্যকে শৌর্য, হঠকারিতাকে বীরত্বের মর্যাদায় ভূষিত করেছি আমরা বছরের পর বছর। ক্লাইভের মত ন্যায়নীতি-বর্জিত হৃদয়হীন দস্যুর কণ্ঠে বীরের জয়মাল্য দিতে আমরা কুণ্ঠিত হইনি। সিরাজউদ্দৌলাকে শুধু যে বর্বরতার দুর্লভ দৃষ্টান্ত হিসেবেই খাড়া করেছি তা নয়, তাঁকে ধিকৃত করেছি চরম কাপুরুষতার গ্লানিতে। নবীন সেনের মত প্রতিভাধর দেশপ্রেমিক কবিও মুখর হয়েছেন সিরাজের কলঙ্ক-কীর্তনে। যদিও সিরাজের হত্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'নিবিল তখন ভারতের শেষ আশা।' অর্থাৎ সিরাজউদ্দৌলা যে বঙ্গদেশ তথা ভারতের স্বাধীনতার সর্বশেষ প্রদীপ সে বিষয়ে কবি সচেতন ছিলেন। তবু ব্যক্তি হিসেবে সিরাজউদ্দৌলার কলঙ্ক-কীর্তনের লোভ তিনি সংবরণ করতে পারেননি। কারণ, অপরের কুৎসায় মানুষের আনন্দ অপরিতৃপ্ত। সে কুৎসা কলঙ্কের ভিয়েনে পরিপক্ব হলে ত কথাই নেই। এক কান থেকে আর এক কান এবং তারপর তৃতীয় চতুর্থ কানে যেতে যেতে প্রথম প্রচারিত কুৎসা শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে মহীরূহ হয়ে ওঠে এবং এক সময়ে মানুষের কাছে তা ইতিহাসের তথ্য সমৃদ্ধ চেহারায় পরিচিত হতে শুরু করে। সিরাজউদ্দৌলার ক্ষেত্রে ইংরেজের সুপরিকল্পিত প্রচারণা ঠিক এই সাফল্যই এনে দিয়েছিল।

মদ্যপ যথেচ্ছাচারী সিরাজউদ্দৌলার তুলনা টাইবেরিয়াস ক্লডিয়াস নীরো, নৃশংসতায় তিনি হালাকু খান, লাম্পট্যে রাসপুটিন। এর চেয়ে জোরালো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়নি বলে কলঙ্কের ঘুড়ি আরও অগ্রসর হতে পারেনি।

সিরাজউদ্দৌলার চরেরা সন্ধান পাবার পরও এ-দেশের কোনো সুন্দরী যুবতী সামাজিক মর্যাদায় ভূষিত ছিল তা কেউ বিশ্বাস করেনি। নিরীহ

মানুষকে নদীতে ডুবিয়ে দিয়ে তার মরণ-অপেক্ষা তিনি উপভোগ করতেন। পূর্ণকাল গর্ভিনীর গর্ভ বিদীর্ণ করে তিনি সন্তানের অবস্থান নির্ণয় করতেন– এ সবই সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে বহুল প্রচারিত কলঙ্ক এবং রসাল কাহিনী।

কিন্তু সত্য হল সর্বগ্রাসী অগ্নি। অসত্যের স্তূপে তা সাময়িকভাবে চাপা পড়লেও নির্বাপিত হয় না। একদিন আবর্জনার আস্তরণ পুড়িয়ে ফেলে সে আত্মপ্রকাশ করে। ইংরেজের সুচতুর চক্রান্তে সিংহাসনচ্যুত এবং নিহত সিরাজউদ্দৌলার জীবন-কাহিনীও সত্যের হাত ধরে ধীরে ধীরে এ-দেশবাসীর সামনে উপস্থিত হতে শুরু করে। অবশ্য সে চেষ্টা সহজ সাধ্য ছিল না। কারণ, পরাধীন মানুষের পক্ষে সত্য ভাষণের অধিকারও ভ্রূকুটির শাসনে অবদমিত। তবু সব আশঙ্কা এবং শাসনের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করেও শুরু হয়েছিল ঐতিহাসিক সত্যের মুক্তি অভিযান। এই অভিযানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের অধিকারী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। অক্ষয়কুমার ইংরেজের কারসাজির জঞ্জাল ঘেঁটে সিরাজউদ্দৌলার কলঙ্ক মোচনের চেষ্টা করেছেন এবং সমসাময়িক কালের সত্য-নির্ভর ইতিহাস নির্মাণের পথিকৃত হয়েছেন। তাঁর গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৩০৪ সালে।

জাতীয় জাগরণের প্রয়োজনে উদ্দীপনার প্রেরণা হিসেবে সিরাজউদ্দৌলা জাতীয় বীরের আসন লাভ করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের নির্ভীক নায়ক রূপে সিরাজউদ্দৌলা সর্বজনপ্রিয় চরিত্র। এই সাফল্যের পথে প্রসারিত হয়েছে জাতীয় নাট্যান্দোলনের মাধ্যমে। উক্ত আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কৃতিত্ব অবিস্মরণীয়। গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটক প্রথম অভিনীত হয় ১৩১২ সালের ২৪শে ভাদ্র। শচীন সেনগুপ্তের সুবিখ্যাত নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়েছে ১৯৩৮ সালের ২৯শে জুন।

রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমেও সিরাজউদ্দৌলার কলঙ্ক মোচনের চেষ্টা হয়েছে। ইংরেজের সুপরিকল্পিত আন্তর্জাতিক প্রচারণায় অবিসংবাদী সত্য হিসেবে গৃহীত সিরাজউদ্দৌলার বর্বরতার সবচেয়ে ভয়াবহ দৃষ্টান্ত 'অন্ধকূপ হত্যা' সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে। অনুরূপ হত্যার স্মারক স্তম্ভ 'হলওয়েল মনুমেন্ট' অপসারণে রাজনৈতিক নেতা সুভাষ চন্দ্র বসুর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা, ছেনী-হাতুড়ি নিয়ে কলঙ্ক-

www.nagorikpathagar.org

স্তম্ভটি চূর্ণ করবার জন্যে তাঁর প্রত্যক্ষ আত্মনিয়োগের আমি চাক্ষুস সাক্ষী।

জাতীয় চেতনা নূতন খাতে প্রবাহিত হয়েছে। কাজেই নূতন মূল্যবোধের তাগিদে ইতিহাসের বিভ্রান্তি এড়িয়ে ঐতিহ্য এবং প্রেরণার উৎস হিসেবে সিরাজউদ্দৌলাকে আমি নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে আবিষ্কারের চেষ্টা করেছি। একান্তভাবে প্রকৃত ইতিহাসের কাছাকাছি থেকে এবং প্রতি পদক্ষেপে ইতিহাসকে অনুসরণ করে আমি সিরাজউদ্দৌলার জীবননাট্য পুনর্নির্মাণ করেছি। ধর্ম এবং নৈতিক আদর্শে সিরাজউদ্দৌলার যে অকৃত্রিম বিশ্বাস, তাঁর চরিত্রের যে দৃঢ়তা এবং মানবীয় সদগুণগুলিকে চাপা দেবার জন্যে ঔপনিবেশিক চক্রান্তকারী ও তাদের স্বার্থান্ধ স্তাবকেরা অসত্যের পাহাড় জমিয়ে তুলেছিল, এই নাটকে প্রধানতঃ সেই আদর্শ এবং মানবীয় গুণগুলিকেই আমি তুলে ধরতে চেয়েছি।

নাটকের বিভিন্ন দৃশ্যে যে তারিখগুলি উল্লেখ করা হয়েছে তার ভেতরে কিছু কিছু অবশ্যই কাল্পনিক। ঐতিহাসিক ঘটনাসূত্রে নথিবদ্ধ তারিখগুলির মাঝে মাঝে এক একটি ঘটনার সময় কল্পনা করে নেওয়া হয়েছে। সেটা ঘটনা প্রবাহের একটা অবিচ্ছেদ্য গতি দেখাবার জন্যে। এটা ইতিহাস-গ্রন্থ নয়। সেই হিসেবে নাটকীয় ঘটনার কাল্পনিক তারিখ-সন্নিবেশ তেমন একটা অপরাধ বলে গণ্য হবে না।

সিকান্দার আবু জাফরের সিরাজ উদ্দৌলা পাঠক ও দর্শক নন্দিত অসাধারণ এক সৃষ্টি। সত্য ইতিহাস, প্রাঞ্জল বাক্য-বিন্যাস, গতিশীল সংলাপ আর দেশপ্রেমের সীমাহীন উচ্ছ্বাসে পূর্ণ এ নাটকটি বাংলা সাহিত্যে অনন্য স্থান দখল করে আছে। সিকান্দারের অনবদ্য এ কীর্তিখানা বেশ কয়েক বছর বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের আওতাধীন উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে পাঠ্য ছিল এবং সেই সুবাদে পড়াশুনার এই খরা আর দেশপ্রেমের আকালের কালে তরুণ সমাজের মানসিক গঠনের খাদ্য তালিকায় এটি চিল এক দায়িত্বশীল সংযোজন। কিন্তু কয়েক বছর আগে বিশেষ কোন অজ্ঞাত কারণে পাঠ্য তালিকা থেকে বইটি বাদ দেয়া হয়। সেই থেকে বইটি অনেকটাই সাধারণ পাঠকেরও দৃষ্টি সীমার বাইরেই চলে গেছে।

যাহোক, বাংলা সাহিত্যে পলাশী বিষয়ে উল্লেখযোগ্য যেসব সাহিত্যকর্ম চোখে

—১০

www.nagorikpathagar.org

পড়ে তার মধ্যে অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় রচিত সিরাজউদ্দৌলা, তপন মোহন চট্টোপাধ্যায়ের পলাশীর যুদ্ধ, মৃণাল চক্রবর্তীর সিরাজউদ্দৌলা, শ্রী পারাবত রচিত আমি সিরাজের বেগম, নিখিল নাথ রায় রচিত মুর্শিদাবাদ কাহিনী অন্যতম। তবে আবারও দুঃখের সাথে উল্লেখ করতে হচ্ছে যে, বাংলা সাহিত্যে পলাশী প্রসঙ্গটি যতটা গুরুত্ব সহকারে আসা দরকার ছিল, এর উপর যতটা কাজ হওয়া দরকার ছিল তার সিকিভাগও হয় নি। তবে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামসহ উপরে বর্ণিত গুটি কয়েক কবি সাহিত্যিক ইতিহাসের সেই দায় ঘুচানোর প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। আসলে বিগত শতকের মোটামুটি মাঝামাঝি সময়কাল পর্যন্ত ঐতিহাসিক লেখক, কবি, সাহিত্যিকদের লেখনিতে যে অনুসন্ধিৎসা লক্ষ করা গেছে তা বর্তমান কালে নিতান্তই অনুপস্থিত। ভবিষ্যতের ইতিহাস গবেষকদের জন্য মূল্যবান উপাদান হবে পলাশী– তাতে সন্দেন নাই। ব্রিটিশ প্রভাবে রচিত সিরাজউদ্দৌলা আর আজকের সিরাজউদ্দৌলার মধ্যে যেমন বিস্তর ফারাক রয়েছে তেমনি সত্যিকার দেশপ্রেমিক নেতৃত্বের ইতিহাস অবশ্যই একদিন উদ্ভাসিত হবে সূর্যালোকের ন্যায়। তবে এক্ষেত্রে এ সময়ের ইতিহাস গবেষক লেখকদের দায় কম নয়। সচেতনভাবে তাঁরা তা এড়িয়ে গেলে ইতিহাসের আস্তাকুঁড় তাদেরই জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে।

অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় তাঁর তথ্যনিষ্ঠ নিরপেক্ষ গবেষণা কর্মের মাধ্যমে সিরাজ চরিত্র সম্পর্কে অনেক ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটান। ইংরেজ ও শত্রুপক্ষের প্ররোচনাই যে সিরাজ চরিত্রে কলংক আরোপ করেছিল অক্ষয় বাবু তা প্রমাণ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'সিরাজদৌলা' প্রবন্ধে অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়ের সিরাজ চরিত্র নতুন করে আবিস্কারের প্রয়াসের ভূয়সী প্রশংসা করে লিখেছেন–

> 'অক্ষয় বাবু হয়তো আদিম প্রকৃতির সেই রূঢ় নিয়মের অধীনে আসিয়াছেন কিন্তু বাংলার ইতিহাসে তিনি যে স্বাধীনতার যুগ প্রবর্তন করিয়াছেন সেজন্য তিনি বঙ্গসাহিত্যে ধন্য হইয়া থাকিবেন।' *(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খণ্ড, আধুনিক সাহিত্য, 'সিরাজদৌলা' (প্রবন্ধ), বিশ্বভারতী, কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৫৮ পৃ. ৫০৪)*

ইতিহাসের সত্যান্বেষী গবেষকদের দ্বারা সিরাজের প্রকৃত রূপটি উদঘাটনের বিষয়কে পরবর্তীকালের গবেষকগণ দেখেছেন এভাবে–

> 'বাংলার সিরাজ পেলেন এদের কাছে ঐতিহাসিক সম্মান। বিদেশীদের হাতে চিত্রিত কলংকিত ইতিহাসের সিরাজ নন; এই সিরাজ নবাবিস্কৃত বাঙালি ঐতিহাসিকদের হাতে রূপায়িত দেশপ্রেমিক প্রজাবৎসল

www.nagorikpathagar.org

> সিরাজ। এই সিরাজ রাজনীতিতে প্রবীন, বয়সে পক্ক, চিন্তায় অগ্রগামী আর কণ্ঠে উত্তাল। বক্তৃতা করে জনসাধারণকে বিভোর করে দেবার সহজাত ক্ষমতায় তিনি অসাধারণ।' *(সেমেন্দচন্দ্র নন্দী, বাংলা ঐতিহাসিক নাটক সমালেচনা, বঙ্গীয় নাট্য সংসদ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮১, পৃ. ২৬৪-৬৫)*

নবাবিস্কৃত সিরাজ সম্পর্কে সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২) তাঁর 'সিরাজদৌল্লা' (১৯০৫) নাটকে লিখেছেন–

> 'বিদেশী ইতিহাসে সিরাজ চরিত্র বিকৃতবর্ণে চিত্রিত হয়েছে। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, শ্রীযুক্ত কালী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শিক্ষিত সুধীগণ অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে বিদেশী ইতিহাস খণ্ডন ধরিয়া রাজনৈতিক ও প্রজাবৎসল সিরাজের স্বরূপচিত্র প্রদর্শনে যত্নশীল হন। আমি ঐ সমস্ত লেখকগণের নিকট ঋণী।' *(গিরিশচন্দ্র ঘোষ, গিরিশ রচনাবলী, সিরাজদৌল্লা, ভূমিকা)*

গিরিশচন্দ্রের সিরাজদৌল্লার ৩৩ বছর পর ১৯৩৮ সালে বিখ্যাত নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত লিখলেন তাঁর বিখ্যাত নাটক 'সিরাজদ্দৌলা' যেখানে তিনি সিরাজকে 'খাটি বাঙালি' হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন–

> সিরাজের পরাজয়ে বাংলারও পরাজয় হয়েছে। তাঁর পতনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালিও পতিত হলো। সিরাজের দেশপ্রেম, তাঁর বাংলা ও বাঙালিপ্রীতি ছিল অবিসংবাদিত। বিলাস-বৈভবের হাতছানি পদদলিত করে বাংলা ও বাঙালির স্বার্থে তিনি জীবন দান করে গেছেন। ইতিহাসে খুব কমলোকের মাঝেই আত্মোৎসর্গের এমন নজির দেখা যায়। দেশ ও জাতির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় তিনি জীবন বাজি রেখেছেন। আমৃত্যু তিনি দেশনায়কের এই সুমহান দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

www.nagorikpathagar.org

উপসংহার

পলাশী যুদ্ধের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এটি আসলে কোনো যুদ্ধ ছিল না, বরং এটি ছিল বাংলা তথা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা হরণের মর্মান্তিক প্রহসনের অগ্রভাগে ছিল ইংরেজ বিনিয়ারা এবং সক্রিয় কিছু লোক ছিল হিন্দু রাজা মহারাজা, জমিদার ও হিন্দু রাজকর্মচারী। পলাশী যুদ্ধ দেশের স্বাধীনতা বিক্রির ইতিহাস এবং একই সাথে তা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এটি সিরাজের প্রাণ বিসর্জনের ও ইতিহাস। পলাশীর ঘটনাকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারলে দেশ-বিরোধী চক্রের হাত থেকে দেশের স্বার্থ রক্ষা করা যাবে এবং দেশ মাতৃকার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সুদৃঢ় হবে। শোষণ হত না। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এ বিষয়ে জাতিকে যে সতর্কবার্তা প্রদান করেছিলেন তার সীমাহীন গুরুত্ব বিবেচনায় পুনরায় উদ্ধৃত্ত করছি–

> কাণ্ডারি! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর,
> বাঙালীর খুনে লাল হল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর
> ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায়, ভারতের দিবাকর
> উদিবে সে রবি আমাদেরই খুনে রাঙিয়া পুনর্বার।

www.nagorikpathagar.org

পলাশী ট্র্যাজেডির
কয়েকটি দুর্লভ চিত্র

www.nagorikpathagar.org

মীর জাফর কর্তৃক নির্মিত জাফরাগঞ্জ কবরস্থান : যেখানে মীর জাফর ও তার পরিবারের অধিকাংশ সদস্যকে কবর দেয়া হয়

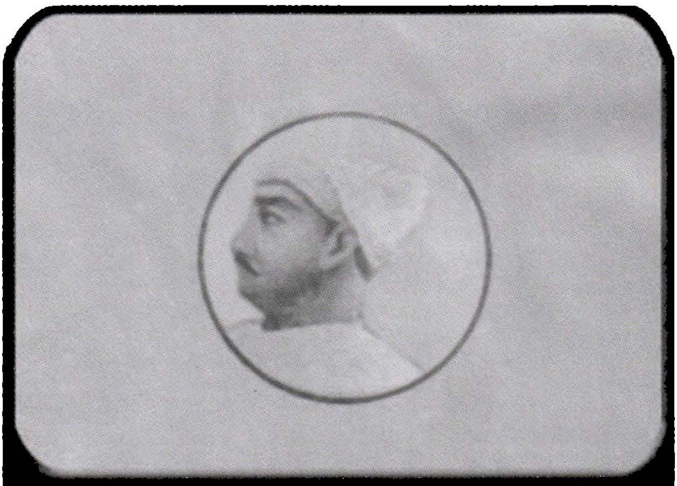

মীর কাশিম

www.nagorikpathagar.org

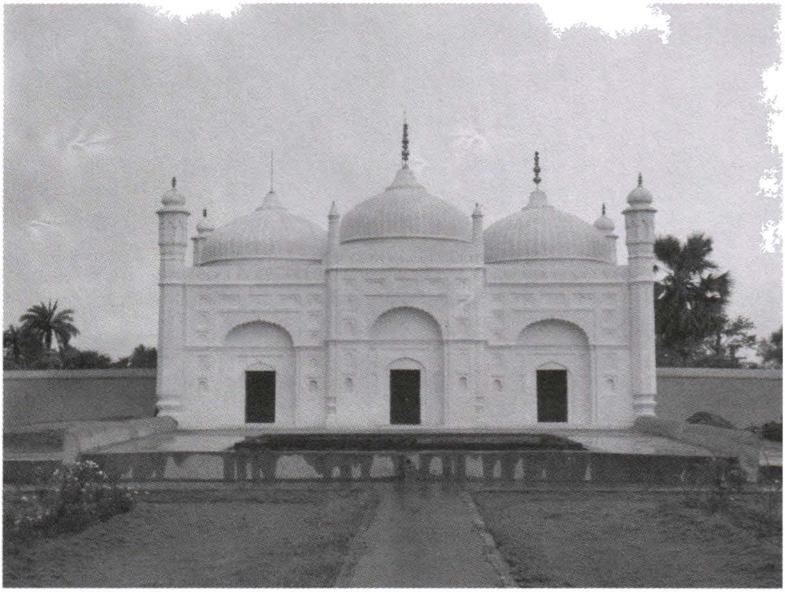

খোশবাগ

মতিঝিল মসজিদ

www.nagorikpathagar.org

খোশবাগ : সিরাজের নানা আলীবর্দী খান কর্তৃক নির্মিত- যেখানে রয়েছে সিরাজ ও তাঁর পরিবারের কবর ।

www.nagorikpathagar.org

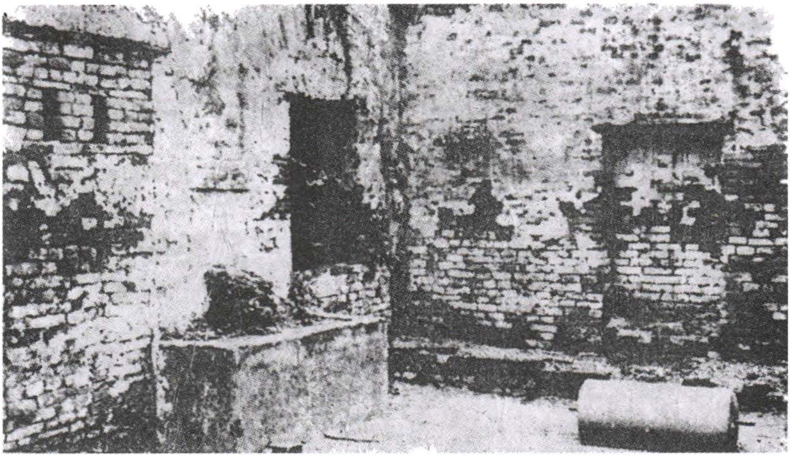

অভিশপ্ত কক্ষ : যেখানে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ উদ্দৌলাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

পলাশী ট্র্যাজেডির সফল মঞ্চায়নের স্বীকৃতিস্বরূপ ক্লাইভকে তার স্বদেশ কর্তৃক প্রদত্ত খেতাব 'ব্যারন অব পলাশী'।

www.nagorikpathagar.org

For the London Mag.

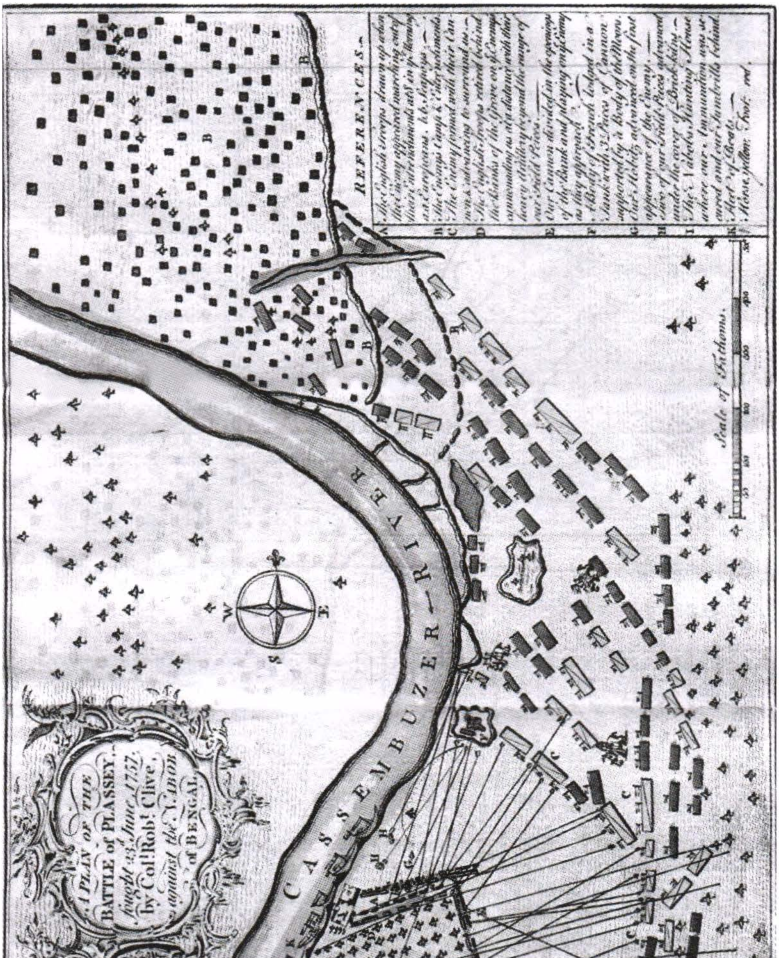

পলাশী যুদ্ধের মানচিত্র

মীর জাফর ও তার পুত্র মীরণ ওয়াটসের নিকট ১৭৫৭ সালের পলাশী চুক্তি হস্তান্তর করছে

পলাশী যুদ্ধ-উত্তর ক্লাইভ-মীর জাফর বৈঠক

www.nagorikpathagar.org

মীর জাফর ও তার পুত্র মীরণ

www.nagorikpathagar.org

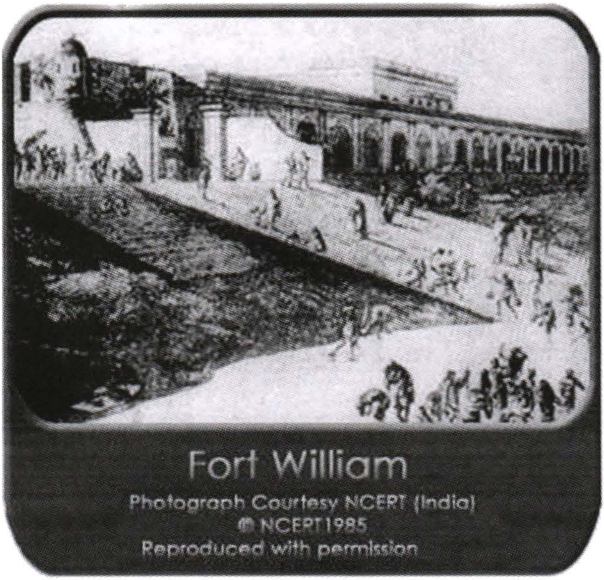

ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ : স্বাধীন ভারতের উপর ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চ্যালেঞ্জ

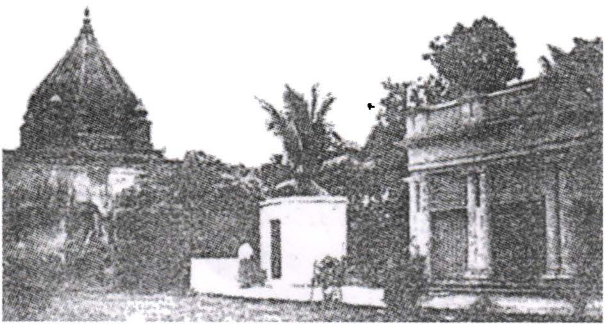

জগৎশেঠের বাড়ি

www.nagorikpathagar.org

নবাব সিরাজ উদ্দৌলা

www.nagorikpathagar.org

নবাব আলীবর্দী খান

ISBN : 984-70168-0067-2

9 847016 800672

বাঙলাকথা

পলাশী ট্র্যাজেডির ইতিবৃত্ত

Palassey Tragedy'r Itibritta

মোঃ জেহাদ উদ্দিন